শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ভূত আছে
ভয় নেই

ভূত আছে ভয় নেই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূর্য পাবলিশার্স
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

Bhoot Acche Bhoi Nei *by Sirsendu Mukhopadhaya*

ISBN 81-89710-09-5

প্রকাশ

বইমেলা ১৪১২

প্রকাশক

নিমাই গরাই

সূর্য পাবলিশার্স

৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ

সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণ

শুভাশিস পালধি

অক্ষর বিন্যাস

গঙ্গা মুদ্রণ

৫৪/১বি শ্যামপুকুর স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০০৪

মুদ্রাকর

নিউ রেনবো ল্যামিনেশন

১৩ এ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য: ৩৫ টাকা

"ভূত আছে ভয় নেই" সংকলনটি আমার কয়েকটি গল্পের একটি গুচ্ছ, বিষয় হিসাবে ভূত আমার খুব প্রিয়, নানা মজার উপাদান হিসাবেই তাদের আবির্ভাব ঘটে থাকে। সুতরাং ভয়াল ভূতের প্রাদুর্ভাব আমার লেখায় বড়ো একটা ঘটে না। পাঠকরা আমার লেখা এই গল্পগুলিতে আনন্দ পেলে খুশি হবো।

বিনীত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কৌটার ভূত	৫
নিশি কবরেজ	৯
টেলিফোনে	১৩
লালটেম	১৯
ঘুড়ি ও দৈববাণী	২৭
কৃপণ	৩২
পুরনো জিনিস	৩৮
ভূতের ভবিষ্যৎ	৪৪
ডবল পশুপতি	৫৪
কোগ্রামের মধুপণ্ডিত	৬১
ইঁদারায় গণ্ডোগোল	৬৭
ভূত ও বিজ্ঞান	৭৫
দুই পালোয়ান	৮০
গুপ্তধন	৮৫
মাঝি	৯১

কৌটোর ভূত

জয়তিলকবাবু যখনই আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আসতেন তখনই আমরা, অর্থাৎ ছোটোরা খুবই খুশিয়াল হয়ে উঠতুম।

তখনকার পূর্ববঙ্গের গাঁ-গঞ্জ ছিল আলাদা রকম, মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, বন-জঙ্গল মিলে এক আদিম আরণ্যক পৃথিবী। সাপখোপ জন্তু-জানোয়ার তো ছিলই, ভূত-প্রেতেরও অভাব ছিল না। আর ছিল নির্জনতা।

তবে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারে মেলা লোকজন, মেলা কাচ্চাবাচ্চা। মেয়ের সংখ্যাই অবশ্য বেশি। কারণ বাড়ির পুরুষেরা বেশির ভাগই শহরে চাকরি করত, আসত কালেভদ্রে। বাড়ি সামাল দিত দাদুটাদু গোছের বয়স্করা। বাবা-কাকাদের সঙ্গে বলতে কি আমাদের ভালো পরিচয়ই ছিল না, তাঁরা প্রবাসে থাকার দরুন। বাচ্চারা মিলে আমরা বেশ হই-হুল্লোড়বাজিতে সময় কাটিয়ে দিতাম। তখন পড়াশুনোর চাপ ছিল না। ভয়াবহ কোনো শাসন ছিল

না। যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু অভাব ছিল একটা জিনিসের। আমাদের কেউ যথেষ্ট পাত্তা বা মূল্য দিত না।

জয়তিলকবাবু দিতেন। আত্মীয় নন। মাঝেমধ্যে এসে হাজির হতেন। কয়েকদিন থেকে আবার কোথায় যেন উধাও হতেন কিন্তু যে কয়েকটা দিন থাকতেন বাচ্চাদের গল্পে আর নানারকম মজার খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

মাথায় টাক। গায়ের রঙ কালো, বেঁটে আঁটো গড়ন আর পাকা গোঁফ ছিল তাঁর। ধুতি আর ফতুয়া ছিল বারোমেসে পোশাক, শীতে একটা মোটা চাদর। সর্বদাই একটা বড়ো বোঁচকা থাকত সঙ্গে। শুনতাম তাঁর ফলাও কারবার। তিনি নাকি সবকিছু কেনেন আর বেচেন। যা পান তাই কেনেন যাকে পান তাকেই বেচেন। কোনো বাছাবাছি নেই।

সে-বার মাঘ মাসের এক সকালে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। হয়েই দাদুকে বললেন, "গাঙ্গুলিমশাই, এবার কিছু ভূত কিনে ফেললাম।"

দাদু কানে কম শুনতেন, মাথা নেড়ে বললেন, "খুব ভালো। এবার বেচে দাও।" জয়তিলক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, "সেটাই তো সমস্যা। ভূত কেনে কে?"

"খদ্দের দিন না?"

"খদ্দর? না বাপু, ওসব আমি পারি না, স্বদেশিদের কাছে যাও।"

"আহা, খদ্দর নয়, খদ্দের, মানে গাহেক।"

"গায়ক! না বাপু, গানবাজনা আমার আসে না।"

জয়তিলক অগত্যা ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি ভূত কিনেছেন শুনে আমাদের চোখ গোল্লা গোল্লা। ঘিরে ধরে, "ভূত দেখাও, ভূত দেখাও" বলে মহা শোরগোল তুলে ফেললুম।

প্রথমে কিছুতেই দেখাতে চান না। শেষে আমরা ঝুলোঝুলি করে তাঁর গোঁফ আর জামা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করায় বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু সব ঘুমন্ত ভূত, শুকিয়ে রাখা।"

"সে আবার কী?"

"আহা, যেমন মাছ শুকিয়ে শুঁটকি হয় বা আম শুকিয়ে আম্‌সি হয় তেমনই আর কি। বহু পুরোনো জিনিস।"

জয়তিলক তাঁর বোঁচকা খুলে একটা জংধরা টিনের কৌটো বের করলেন। তারপর খুব সাবধানে ভিতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন,

"বেশি গোলমাল কোরো না, এক-এক করে উঁকি মেরে দেখে নাও। ভূতেরা জেগে গেলেই মুশকিল।"

কী দেখলুম তা বলা একটা সমস্যা। মনে হল শুকনো পলতা পাতার মতো চার-পাঁচটা কেলেকুষ্টি জিনিস কৌটোর নীচে পড়ে আছে। কৌটোর ভিতরটা অন্ধকার বলে ভালো বোঝাও গেল না। জয়তিলক টপ করে কৌটোর মুখ এঁটে দিয়ে বললেন, "আর না। এসব বিপজ্জনক জিনিস।"

বলা বাহুল্য, ভূত দেখে আমরা আদপেই খুশি হইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে, ওগুলো মোটেই ভূত নয়। জয়তিলকবাবুকে ভালো মানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়েছে।

জয়তিলকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না হে, ঠকায়নি। চৌধুরী বাড়ির বহু পুরোনো লোক হল গোলোক। সারাজীবন কেবল ভূত নিয়ে কারবার। তার তখন শেষ অবস্থা, মুখে জল দেওয়ার লোক নেই। সেই সময়টায় আমি গিয়ে পড়লাম। সেবাটেবা করলাম খানিক, কিন্তু তার তখন ডাক এসেছে। মরার আগে আমাকে কৌটোটা দিয়ে বলল, "তোমাকে কিছু দিই এমন সাধ্য নেই। তবে কয়েকটা পুরোনো ভূত শুকিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, কাজ হতে পারে। ভূতগুলোর দাম হিসেব করলে অনেক। তা তোমার কাছ থেকে দাম নেবই বা কী করে, আর নিয়ে হবেই বা কী। তুমি বরং আমাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াও। শেষ খাওয়া আমার", এই বলে জয়তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা তবু বিশ্বাস করছিলুম না দেখে জয়তিলকবাবু বললেন, "মরার সময় মানুষ বড়ো একটা মিছে কথা বলে না।"

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সেকথা আর বললুম না তাঁকে।

দুপুরবেলা যখন জয়তিলকবাবু খেয়েদেয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে ঘুমোচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে আমি আর বিশু তাঁর ভূতের কৌটো চুরি করলুম। এক দৌড়ে আমবাগানে পৌঁছে কৌটো খুলে ফেললুম। উপুড় করতেই পাঁচটা শুকনো পাতার মতো জিনিস পড়ল মাটিতে। হাতে নিয়ে দেখলুম, খুব হালকা। এত হালকা যে জিনিসগুলো আছে কি নেই তা বোঝা যায় না। ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে মনে হল, এগুলো পাতাটাতা নয়। অনেকটা ঝুল-জাতীয় জিনিস, তবে পাক খাওয়ানো, বেশ ঠাণ্ডাও।

বিশু বলল, "ভূত কি না তা প্রমাণ হবে যদি ওগুলো জেগে ওঠে।"

"তা জাগাবি কী করে?"

"আগুনে দিলেই জাগবে। ছ্যাঁকার মতো জিনিস নেই।"

আমরা শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেললুম। আঁচ উঠতেই প্রথমে একটা ভূতকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলুম।

প্রথমে একটা উৎকট গন্ধ উঠল। তারপর আগুনটা হঠাৎ হাত দেড়েক লাফিয়ে উঠল। একটু কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তারপরই হড়াস করে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা কেলে চেহারার বিকট ভূত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দুখানা কটমট করছে।

"ওরে বাবা রে" বলে আমরা দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। পড়ে গিয়ে দেখলুম জ্যান্ত ভূতটা আর চারটে ঘুমন্ত ভূতকে তুলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।

চোখের পলকে পাঁচ-পাঁচটা ভূত বেরিয়ে এল। তারপর হাসতে হাসতে তারা আমবাগানের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘটনাটির কথা আমরা কাউকেই বলিনি। জয়তিলকবাবুর শূন্য কৌটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রবল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। রান্নাঘরে ভূত, গোয়ালে ভূত, শোয়ার ঘরে ভূত, পুকুরে ভূত, কুয়োপাড়ে ভূত। এই তারা হিঁ হিঁ করে হাসে, এই তারা মাছ চুরি করে খায়। এই ঝি-চাকরদের ভয় দেখায়। সে ভীষণ উপদ্রব। ভূতের দাপটে সকলেই তটস্থ।

জয়তিলকবাবু এইসব কাণ্ড দেখে নিজের কৌটো খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, "এঃ হেঃ, ভূতগুলো পালিয়েছে তা হলে! ইস্, কী দারুণ জাতের ভূত ছিল, বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যেত। নাঃ, ভূতগুলোকে ধরতেই হয় দেখছি," এই বলে জয়তিলকবাবু মাছের জাল নিয়ে বেরোলেন। ভূত দেখলেই জাল ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু জালে ভূত আটকায় না। জয়তিলকবাবু আঠাকাঠি দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু ভূতের গায়ে আঠাও ধরে না। এরপর জাপটে ধরার চেষ্টাও যে না করেছেন তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই ভূতদের ধরা গেল না।

দুঃখিত জয়তিলকবাবু কপাল চাপড়ে আবার শুঁটকি ভূতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

পাঁচ-পাঁচটা ভূত দাপটে আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করতে লাগল।

নিশি কবরেজ

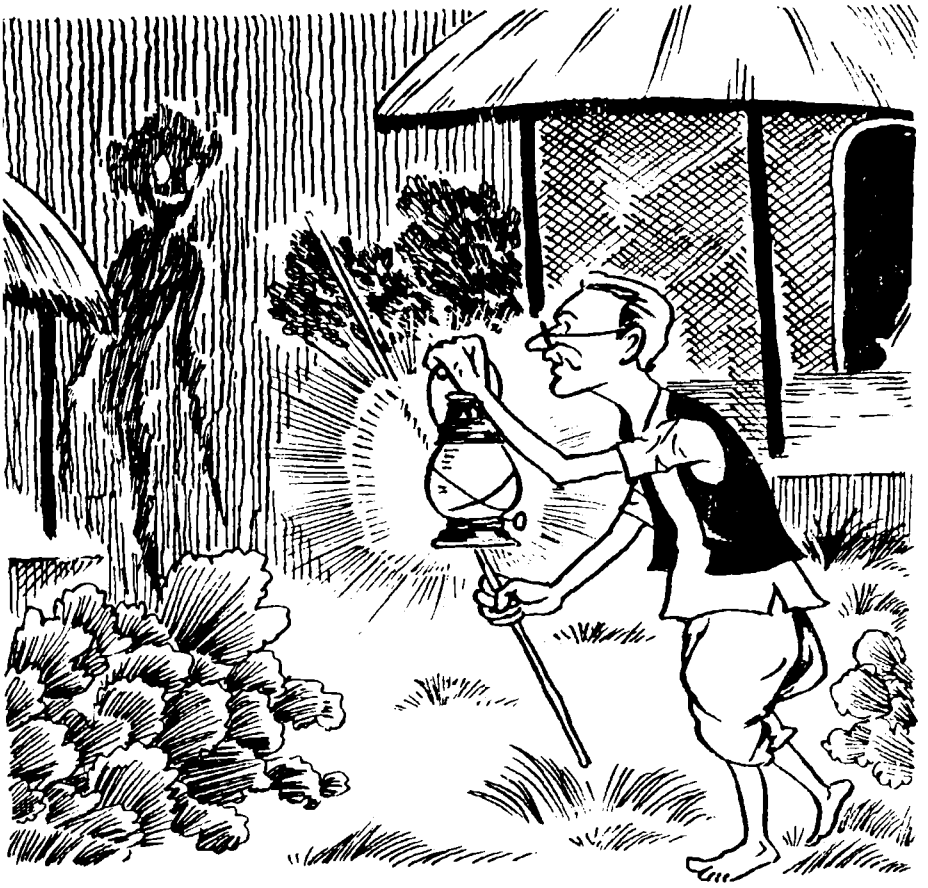

হারানো একটা পুঁথিতে নিশি কবরেজ একটা ভারি জব্বর নিদান পেয়েছেন। গাঁটের ব্যথার যম। তবে মুশকিল হল পাঁচনটা তৈরি করতে যে পাঁচরকম জিনিস লাগে তার চারটে জোগাড় করা যায়। কিন্তু পাঁচ নম্বরটাই গোলমেলে। পাঁচ নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আধ ছটাক ভূত।

নিশি কবরেজ রাতে খাওয়ার পর দাঁড়িয়ে আচমন করছিলেন। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিঃঝুম। শীতকালের কুয়াশা আর ঠাণ্ডাটাও জেঁকে পড়েছে। আঁচাতে আঁচাতে নিশি কবরেজ পাঁচনটার কথাই ভাবছিলেন। রাজবল্লভবাবু বিরাট বড়োলোক! কিন্তু গাঁটের ব্যথায় শয্যাশায়ী। ব্যথাটা আরাম করতে পারলে রাজবল্লভবাবু হাজার টাকা অবধি দিতে রাজি বলে নিজে মুখে কবুল করেছেন। কিন্তু ভূতটাই সব মাটি করলে। আধ ছটাক ভূত

এখন পান কোথায়? হঠাৎ নিশি কবরেজের মনে হল, উঠোনের ওপাশটায় হাঁসের ঘরের পাশটায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—কে রে? ওখানে কে?

কেউ জবাব দিল না।

নিশি কবরেজ জলের ঘটিটা ঘরে রেখে হ্যারিকেন আর লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দিনকাল ভালো নয়। চোর-ছ্যাঁচড়ের দারুণ উপদ্রব। ঘরে কিছু কাঁচা টাকাও আছে। সোনাদানাও মন্দ নেই।

বাঁ হাতে হ্যারিকেনটা তুলে ডানহাতের লাঠিটা নাচাতে নাচাতে কয়েক পা এগোতেই উঠোনের ওপাশ থেকে একটু গলা খাঁকারির বিনয়ী শব্দ হল। চোরের তো গলা খাঁকারি দেওয়ার কথা নয়।

—কে রে? ওখানে কে?

ওপাশ থেকে খোনাসুরে জবাব এল। ইয়ে, আমি হলুম গে রামহরি—না, না, খুড়ি, আমি হলুম ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ আলোটা ভালো করে তুলে ধরে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, রামহরি বা ধনঞ্জয় নামে এ গাঁয়ে আবার কে আছে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি? দরকারটাই বা কী? রুগী দেখতে হলে রাতে বিশেষ সুবিধে হবে না বলে রাখছি। দিনের বেলা এসো।

কে যেন বলে উঠল, আজ্ঞে ওসব কিছু নয়।

নিশি কবরেজ লোকটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। তাঁর চোখের জোর কিছু কম নয়। হ্যারিকেনেও কালি পড়েনি। তবু ভালোমতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, হাঁসের ঘরের পাশে খুব কালো একটা লম্বাপানা ছায়া ছায়া কী যেন।

নিশি কবরেজ মনে মনে ভাবলেন, এঃ চোখের বোধহয় বারোটা বাজল এতদিনে। না, কাল থেকে চোখে তিন বেলা ত্রিফলার জল দিতে হবে।

নিশি কবরেজ বললেন, রুগীর ব্যাপার নয় তো এত রাতে চাও কী? চোর-টোর নও তো বাপু?

—আজ্ঞে না, চোর-ডাকাত হওয়ার উপায়ও নেই কিনা। একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আজ্ঞে।

—সমস্যাটা কী?

—আজ্ঞে বলে দিতে হবে যে আমি রামহরি, না ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ খ্যাঁক করে উঠে বললেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রামহরি না ধনঞ্জয় তা আমি কী করে বলব? আমি তোমাকে চিনিই না।

—আজ্ঞে আপনি আমাদের চেনেন—থুড়ি চিনতেন। আমরা দুজনেই গেলবার ওলাওঠায় মরলুম, মনে নেই? আপনার পাঁচন ফেল মারল।

নিশি কবরেজ আঁতকে উঠে বললেন, 'তোমরা? ওরে বাবা!'

—'আজ্ঞে ভয় খাবেন না। আমরা ভারি দুর্বল জিনিস।'

নিশি কবরেজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পাঁচনের দোষ নেই বাবা, সবই কপালের ফের। আমাকে তোমরা মাপ করো।

—আজ্ঞে সেজন্য আপনাকে আমি দুষতে আসিনি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে। ভূত হওয়ার পর আমরা সব কেমন যেন ধোঁয়াটে মার্কা হয়ে গেলুম। শরীর-টরীর নেই, তবু কী করে যেন আছি। তা আমরা অর্থাৎ আমি আর ধনঞ্জয়—মানে আমি আর রামহরি—মানে কে যে কোন্ জন তা বলা মুশকিল—তা আমরা দুজন খুব মাখামাখি করি। খুব বন্ধুত্ব ছিল তো দুজনে। এ ওর শরীরে ঢুকে যাই, ও এর শরীরে মিশে যায়। কিন্তু ওই মাখামাখি করতে গিয়েই কে যে কোন্ জন তা গুলিয়ে গেছে।

—বল কী?

—আজ্ঞে সেই কথাটাই তো বলতে আসা। দুজনে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কখনও আমি বলি যে, আমি রামহরি, ও ধনঞ্জয়। কখনও ও বলে যে, ও রামহরি আমি ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ এই শীতেও ঘামছিলেন। হাতের হ্যারিকেন আর লাঠি দুই-ই ঠকাঠক করে কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। মাথা ঘুরছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, গাঁটের ব্যাথার পাঁচনটার জন্য আধ ছটাক ভূত লাগবে।

নিশি কবরেজ এক গাল হাসলেন। তাঁর হাত পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, এ আর বেশী কথা কী? তবে এখন তোমার যেমন বেগুন পোড়ার মতো চেহারা হয়েছে তাতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটু ধৌতি দরকার। বেশি কষ্ট হবে না। একটা পাঁচনের মধ্যে মিনিট দশেক সেদ্দ করে নেব তোমাকে, তাতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে।

বটে!—বলে কালো জিনিসটা এগিয়ে এল।

নিশি কবরেজ আর দেরি করলেন না। নিশুতিরাতেই পাঁচনটা উনুনে বসিয়ে

কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ভূতটা সেদ্ধ হতে হতে মাঝখানেই মাথা তুলে বলে, হল?

নিশি কবরেজ অমনি কাঠের হাতাটা দিয়ে সেটাকে ঠেসে দিতে দিতে বলেন, হচ্ছে হে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করলে কি হয়? তোমার তো আর গায়ে ফসকা পড়ছে না হে!

পাঁচনটা ভোররাতে তৈরি হয়ে গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় ভূতের ঝুলকালো রঙটাও একটু ফ্যাকাসে মারল। নিশি কবরেজ খুব ভালো করে জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আরে, তুমি তো রামহরি!

ভূতটা একথায় ভারি খুশি হয়ে বলল, আজ্ঞে বাঁচালেন, ধনঞ্জয়ের কাছে রামহরি গোটা তিনেক টাকা পেত কিনা। ভারি দুশ্চিন্তা ছিল আমার। পেন্নাম হই আজ্ঞে। বলে ভূতটা মিশে গেল।

নিশি কবরেজ পাঁচনটা বোতলে পুরে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খেতে বসলেন, বড্ড ধকল গেছে।

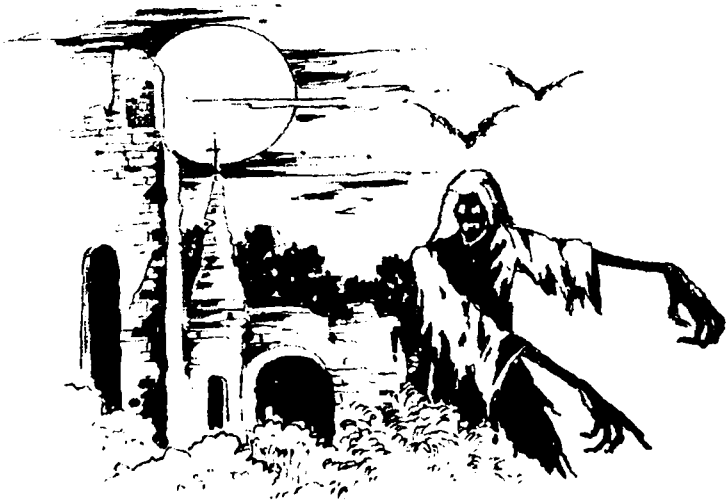

টেলিফোনে

টেলিফোন তুলতেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....।'

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতাটা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ

তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা একচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড়ো অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড়ো পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, 'হ্যালো! হ্যালো!'

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো ওপাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে!

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....।'

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, 'সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গণ্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।'

'কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।'

'হয়তো ক্রশ কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরোন, তাই মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।'

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশন কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান.....'গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার.....?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গল্‌ফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দিজ ইজ দ্য ডে.....দিস ইজ দ্য ডে.....'

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, 'হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?'

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, 'দিস ইজ দ্য ডে.....দিস ইজ দ্য ডে.....'।

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড়ো ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে গলফ্ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধ্যেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে

ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গল্‌ফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গল্‌ফের বিশাল মাঠ। মাঝে-মধ্যে ঝোপ-জঙ্গল, জলা। অনেক গল্‌ফ খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নীচু বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'দিস ইজ দ্য ডে.....'

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশেপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'এই নম্বর তো!'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?'

'প্রদীপ রায়।'

'ওঃ হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?'

'না। বিলটা একটু ইররেগুলার। ক্লারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।'

'খুব ভালো। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।'

'বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

'হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।'

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, 'হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে.....'

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা। গুড নাইট।'

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

লালটেম

লালটেম কারো পরোয়া করে না। সে আছে বেশ। সকালবেলা সে তিনটে মোষ নিয়ে চরাতে বেরোয়। এ জায়গাটা ভারি সুন্দর। একদিকে বেঁটে-বেঁটে চা-বাগানের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার। অন্য ধারে বড়ো একটা মাঠ। মাঠের শেষে তিরতিরে একটা ঠাণ্ডা জলের পাহাড়ি নদী—তাতে সব সময়ে নুড়ি-পাথর গড়িয়ে চলে। নদীর ওপারে জঙ্গল। আর তার পরেই থমথম করে আকাশ-তক উঠে গেছে পাহাড়। সামনের পাহাড়গুলো কালচে সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর শুধু চূড়ার দিকটা দেখা যায়—সেগুলো সকালে সোনারঙের দেখায়, দুপুরে ঝকঝকে সাদা, আর সন্ধের মুখে মুখে ব্রোঞ্জের মতো কালোয় সোনায় রঙ ধরে থাকে। আর চারপাশে সারাদিন মেঘবৃষ্টি রোদ

আর হাওয়ার খেলা। গাছে-গাছে পাখি ডাকে, কাঠবেড়ালি গাছ বায়, নদীর ওপাশে সরল চোখের হরিণ অবাক হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে আর থমকে-থমকে থেমে জল খেতে আসে।

লালটেম বেশ আছে! মোষ নিয়ে সে মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এক জায়গায় বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খায়। নদীর জল খায়। তারপর খেলা করে। তার সঙ্গী-সাথি কিছু কম নেই। তারাও সব মোষ গোরু বা ছাগল চরাতে আসে। যে যার জীবজন্তু মাঠে ছেড়ে দিয়ে চোর-চোর খেলে, ডাণ্ডাগুলি খেলে, নদীতে নেমে সাঁতরায়, আরো কত কী করে।

দুপুরের দিকে খুব খিদে পেলে বাড়ি ফিরে লালটেম খায়। কিন্তু সব দিন খাবার থাকে না। যেদিন থাকে না সেদিন লালটেম টের পায়। তাই সেদিন সে বাড়ি ফেরে না। দুপুরে সে গাছের পাকা ডুমুর কি আমলকী পেড়ে খায়। বেলের সময় বেল পাড়ে, কখনো বা টক আম বা বাতাবিলেবু পেয়ে যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে। তাই খায়। খেয়ে সবচেয়ে বুড়ো আর শক্ত চেহারার মোষ মহারাজার পিঠে উঠে চিৎপাত হয়ে ঘুমোয়।

ছোট ইস্টিশনটার গা ঘেঁষে লালটেমদের ঝুপড়ি। তার বাবা পেতলের থালায় সাজিয়ে পেঁড়া বিক্রি করে ট্রেনের সময়ে। বাজারে বড়ো বড়ো কারবারিদের কাছে ভেঁসা ঘি বেচে, দুধ দেয় বাড়ি-বাড়ি। তিনটে মোষের দুটো হচ্ছে মেয়ে মোষ। মহারাজা পুরুষ। মেয়ে-মোষই বছরের কোনো-না-কোনো সময়ে দুধ দেয়। বুড়ো মোষটার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে দুর্দিন। লালটেমদের সংসার বেশ বড়ো। মা ঘুঁটে দিয়ে বিক্রি করে, বাবা দুধ পেঁড়া, ঘি বেচে। এই করে কোনোরকমে দশজনের সংসার চলে। লালটেমদের দাদু আছে, আর ছয় ভাই-বোন আছে! তারা কোনো লেখাপড়া শেখেনি। মাঝে-মাঝে মোষের দুধ, ঘি বা পেঁড়া ছাড়া কোনো ভালো খাবার খায়নি, খাটো ধুতি বা শাড়ি ছাড়া ভালো জামাকাপড় পরেনি, তারা একসঙ্গে একশো টাকাও কখনো চোখে দেখেনি।

তবু লালটেম কারো পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সাথিদের সঙ্গে সে খেলা করে, আর চারদিককার আকাশ বাতাস আলো পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটা রোগা মানুষ ওপর থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার গা ময়লা চাদরে ঢাকা, পরনে একটা পাজামা, কাঁধে মস্ত এক পুঁটুলি। লালটেম আর তার সাথিরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল।

কারণ, নদীর ওপারে জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গণ্ডার আছে, সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, একমাত্র কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও আবার দল বেঁধে যায়, সঙ্গে লাঠি থাকে, বল্লম থাকে, তীর ধনুক থাকে, আর কুড়ুল তো আছেই।

লোকটা জল থেকে উঠেই পোঁটলাটি মাটিতে রেখে একগাল হেসে বলল, "একটা জিনিস দেখবে?"

"হ্যাঁ-আ" লালটেমরা খুব রাজি।

লোকটা ধীরে আস্তে পুঁটুলির গিঁট খুলে চাদরটা মেলে দিল। লালটেমরা অবাক হয়ে দেখে, ভিতরে কয়েকটা ইঁট।

তারা সমস্বরে বলে ওঠে, "এ তো ইঁট!"

রোগা লোকটা হেসে বলল, "ইঁট ঠিকই, তবে সাধারণ ইঁট নয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো একটা রাজবাড়ির জিনিস। ওই জঙ্গলের মধ্যে আমি সেই রাজবাড়ির খোঁজ পেয়েছি।"

রাজা বা রাজবাড়ি সম্পর্কে লালটেমের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে জানে, একজন রাজা সোনার রুটি খেতেন! তাঁর রানি যে শাড়ি পরতেন সেটা জ্যোৎস্নার সুতো দিয়ে বোনা।

লোকটা ইঁটগুলোকে পুঁটুলিতে বেঁধে হাত ঝেড়ে বলল, "সেই রাজবাড়িটায় অনেক কিছু মাটির নীচে পোঁতা আছে। যে পাবে সে এক লাফে বড়োলোক হয়ে যাবে। তবে কিনা সেখানে যখেরা পাহারা দেয়, সাপ ফণা ধরে আছে চারদিকে। যাওয়া শক্ত।"

লালটেম বলে, "তুমি তাহলে বড়োলোক হলে না কেন?"

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আমি! আমি বড়োলোক হয়ে কী করব? দুনিয়াতে আমার কেউ নাই। দিব্যি আছি, ঘুরে-ঘুরে সময় কেটে যায়। রাজবাড়িটা দেখতে পেয়ে আমি শুধু লোককে দেখানোর জন্য কয়েকটা ইঁট কুড়িয়ে এনেছি। এইতেই আমার আনন্দ।"

লালটেম বলে, "তোমাকে বাঘ ধরল না? সাপে কাটল না? বুনো মোষ তাড়া করল না?"

লোকটা ভালোমানুষের মতো বলে, "জানোয়াররাও বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে। আমি নিরীহ মানুষ, ওরাও সেটা টের পেয়েছিল। তাই কিছু বলেনি।"

লোকটা তারপর গান গাইতে-গাইতে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। লালটেম তার সাথিদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় কোদাল গাঁইতি হাতে কয়েকজন লোক নদীর ধারে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন লোককে লালটেম চেনে। সে হল এ অঞ্চলের নামকরা গুণ্ডা আর জুয়াড়ি প্রাণধর। লালটেমকে ডেকে সে লোকটা বলল, "এই ছোঁড়া, ওই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে?"

লালটেম ভালোমানুষের মতো বলে, "কাঠুরেদের পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে।"

লোকটা কটমট করে চেয়ে বলে, "আমরা যে এদিকে এসেছি, খবরদার কাউকে বলবি না।"

লোকগুলো হেঁটে শীতের নদী পার হয়ে ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালটেমরা মুখ-তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু বাদেই আবার কোদাল-শাবল হাতে একদল লোক আসে। তারাও জঙ্গলের মধ্যে পথ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে, তারপর লালটেমরা যাতে আর কাউকে না বলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন যে এভাবে কত লোক জঙ্গলের মধ্যে গেল তার গোনাগুনতি নেই। তাদের মধ্যে কানা, খোঁড়া, বুড়ো, কচি, বড়োলোক, গরিব সবরকম আছে। চোরের মতো হাবভাব সবার। কী যেন গোপন করছে। এদের দলে লালটেম নিজের বাবাকেও দেখে অবাক হয়।

বাবা লালটেমকে দেখে কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমার ফিরতে দুদিন দেরি হবে। সাবধানে থেকো। মোষগুলোকে যত্নে রেখো। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ো, পেঁড়া বেচো, ঘি বিক্রি কোরো।"

বাবা গেল। কিছুক্ষণ পরে একদল ঘুঁটেউলিদের সঙ্গে মাকেও জঙ্গলে যেতে দেখল লালটেম।

মা কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে বলল, "আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা। একদিন বা দুদিন। তুমি সব সামলে রেখো।"

সেই রোগা লোকটা গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে রাজবাড়ির কথা রটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন তাই লোভী মানুষেরা চলেছে। সেই রাজবাড়ির খোঁজে। লালটেম তাই অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

দুদিন গেল। তিনদিন গেল। লালটেম আর তার সাথিরা রোজ মোষ চরাতে আসে। এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারে জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেরই বাপ মা, আপনজনেরা জঙ্গলে গেছে। কেউই এখনো ফেরেনি!

দাঁড়িয়ে তারা একটু অপেক্ষা করে। তারপর আবার খেলায় মাতে। নদীতে স্নান করে গাছে উঠে খাওয়ার যোগ্য ফলপাকুড় খোঁজে। মোষের পিঠে শুয়ে থাকে।

চারদিনের দিন সন্ধ্যেবেলা একটা লোক জঙ্গল থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। পড়ে আর ওঠে না। লালটেমরা দৌড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তুলে তাকে এপারে নিয়ে আসে।

লোকটা প্রাণধরের এক স্যাঙাত। তার চোখ রক্তবর্ণ. পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে খিদেয়, ভালো করে কথা বলতে পারছে না। লালটেম গিয়ে শালপাতায় নদীর জল তুলে এলে তাকে খাওয়ায়। তারপর মাকাই ভাজা দেয়।

লোকটা একটু দম পেয়ে বলল, "সব মিথ্যে কথা। রাজবাড়ি কোথাও নেই। আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে খুঁজেছি। খাবার নেই, জল নেই। সারা পথে নানারকম বিপদ। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গেছে।"

এইরকম ভাবে দু-চারদিন পরে পরে একটি-দুটি হা-ক্লান্ত লোক ফিরে এসে তাদের বিপদের কথা জানায়। তারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হয়েছে। বহু লোক বাঘের পেটে গেছে। কিছু মরেছে বুনো হাতি, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োরের পাল্লায় পড়ে। বহু লোককে সাপে কেটেছে। জঙ্গলে খাবার নেই, জল নেই, পথ নেই। সেখানে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে মরতে হয়।

গা-ভরতি জ্বর নিয়ে একদিন লালটেমের বাবা ফেরে। শরীর শুকিয়ে সিকি ভাগ হয়ে গেছে। তার ওপর বিড়বিড় করে বকছে—রাজবাড়ি। সোনা-দানা! বাপ রে বাপ!

এর দুদিন বাদে ফিরল মা। লালটেম দেখল তার মা এ কয়েকদিনেই খুনখুনে বুড়ি হয়ে গেছে। মাজা বেঁকে যাওয়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথায় চুল পেকে শনের গুছি গলার স্বরে একটা কাঁপ ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একে-একে সবাই ফিরে এসেছে। মরেনি কেউই। তবে সকলেরই ভীষণ বিপদ হয়েছিল। নানারকম বিপদ আর কষ্ট সহ্য করে মরতে-মরতে ফিরেছে। তবে মানুষগুলো আর আগের মতো নেই। যুবকরা বুড়ো হয়ে ফিরেছে, বুড়োরা অথর্ব হয়ে গেছে, আমুদে লোকেরা দুঃখী, দুঃখীরা পাথর হয়ে এসেছে। কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই।

লালটেম আজকাল মোষ চরাতে চরাতে খুব রাজবাড়ির কথা ভাবে। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে রাজবাড়ির জন্যে লোকগুলো হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েছিল কেন!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। মোষ মহারাজার পিঠে গামছা পেতে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়েছিল লালটেম। বুড়ো মোষটা ঘাস খেতে-খেতে নদীর ধারে এল। তারপর লালটেমকে পিঠে নিয়ে নদীতে নামল জল খেতে। জল খেয়ে খুব ধীরে-ধীরে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগল।

লালটেম ঘুম থেকে উঠে হাঁ। এ সে কোথায়? মহারাজা তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর শেষ হয়ে রোদে বিকেলের নরম আভা লেগেছে। চারদিকে গভীর স্বরে পাখিরা ডাকছে। পাতা খসে পড়ছে গাছ থেকে। সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে আর চিকড়ি-মিকড়ি আলো-ছায়ায় সামনেই এক বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে পড়া খিলান, গম্বুজ, পাথরের পরি, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়ির চূড়ায় এখনো একটা সোনার কলস চিকমিক করছে।

লালটেম হাঁ করে আছে তো আছেই। মহারাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়তে সেই শব্দে লালটেম সচকিত হয়ে মাটিতে নামল লাফ দিয়ে। তাই তো! এই তো সেই রাজবাড়ি হচ্ছে। এক পা দু পা করে লালটেম এগোয়।

চারদিকে শ্যাওলা পাথর আর ইঁটের স্তূপ। এই সেই ইঁট, যা রোগা লোকটা তাদের দেখিয়েছিল। সুতরাং এইটাই রাজবাড়ি। লালটেম দেখে চারধারে নানা রঙের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সাপ ফণা তুলেছে। ফোঁ ফোঁ ভয়ঙ্কর শব্দ করছে তারা। কোত্থেকে একটা দুটো তক্ষক ডাকল। ছমছম করে ওঠে এখানকার নির্জনতা। লালটেম ভয় পায় বটে, কিন্তু তবু এগোয়। সাপেরা তার পথ থেকে সরে সরে যায়।

চারদিকে ফিসফাস শব্দ ওঠে। কারা যেন হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে কাছেই। চারদিকে চেয়ে লালটেম কাউকে দেখতে পায় না। আবার এগোয়।

কী করুণ অবস্থা! বিশাল ঘরের আধখানা ভেঙে পড়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটায় ধুলো জঞ্জাল আর আগাছা। মাকড়সার জাল এত ধারালো যে গায়ে লাগলে চামড়া চিরে যায়। কাঁকড়াবিছেরা বাসা করে আছে যেখানে-সেখানে, একটা ঘরে শেয়ালের বাচ্চারা দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একটা জংধরা লোহার সিন্দুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটা দাঁতাল শুয়োর।

একটার পর একটা ভাঙা ঘর পার হয় লালটেম। দেখে, অনেকগুলো বন্ধ কুঠুরি। কৌতূহলবশে সে একটা কুঠুরির দরজা ঠেলা দিতেই দরজাটা মড়াত করে ভেঙে পড়ে গেল। লালটেম ভিতরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে দেখে, সেখানে অনেক সোনা-রূপোর বাসন পাঁজা করে রাখা।

পাশের কুঠুরিতে ঢুকে লালটেম হাজার-হাজার মোহর দেখতে পেল। পাশেরটায় গয়না, হীরে, মুক্তো।

কত কী রয়েছে রাজবাড়িতে। দেখে লালটেম অবাক তো অবাক। সব কিছু সে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নেড়েচেড়ে দেখে, তারপর আবার যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে দেয়।

সাতটা কুঠুরির সব-শেষটায় ঢুকে লালটেম দেখে ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল। ভীষণ ভয় পেয়ে লালটেম দরজার দিকে পিছু হটে সরে এল।

হঠাৎ কঙ্কালটা নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে কঙ্কালটা বলল, "লালটেম, যেয়ো না।"

এক বোঝা হাড় নিয়ে খটমট শব্দ করে আস্তে আস্তে কঙ্কালটা উঠে বসে।

লালটেম দেখে, কঙ্কালটার পাঁজরের মধ্যে একটা কালো সাপ, মাথায় খুলির ভিতর থেকে চোখ আর নাকের ফুটো দিয়ে কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে আসছে, আর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থিক্‌থিক্ করছে।

কঙ্কালটা হাত তুলে বলে, "আমার দশা দেখেছ?"

"দেখছি।"

"ভয় পেয় না। এখানে যা কিছু দেখছ, সব সোনাদানা মোহর, গয়না এ সবই তোমার। নিয়ে যাও।"

লালটেম মাথা নেড়ে বলে, "নিয়ে কী হবে?"

"অভাব থাকবে না। খুব বড়োলোক হয়ে যাবে। নাও।"

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় মহারাজা ডাকল 'হাংগা'।

লালটেম চমকে উঠে বলল, "আমার মোষটার জলতেষ্টা পেয়েছে। আমি এবার যাই।"

"যেয়ো না লালটেম। কিছু নিয়ে যাও।"

মহারাজা আবার ডাকে 'আঃ আঃ'

লালটেম ছটফট করে বলে, "বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।"

"তোমার মোষগুলো বুড়ো হয়েছে লালটেম, একদিন মরবে তখন বড় দুর্দিন হবে তোমাদের। এইবেলা বড়োলোক হয়ে যাও।"

মহারাজা বাইরে ভীষণ দাপিয়ে চেঁচায় 'গাঁ....গাঁ।'

লালটেম একটু হেসে বলে, "আমার দিন খারাপ যায় না। বেশ আছি।"

কঙ্কালটা রেগে গিয়ে বলে, "গাঁ গঞ্জের হাজারো মানুষ যে রাজবাড়ি খুঁজেখুঁজে হয়রান, সেই রাজবাড়ি পেয়েও তুমি বড়োলোক হবে না?"

লালটেম একটু ভেবে বলে, "না, আমি তো বেশ আছি। চারদিকে কত আনন্দ! কত ফুর্তি!"

সাপটা ফোঁস করে কঙ্কালটার পাঁজরায় একটা ছোবল দিল। উঃ করে কঙ্কালটা পাঁজর চেপে ধরে বলল, "গত একশ বছর ধরে রোজ ছোবলাচ্ছে রে বাপ।.....ইঃ, ওই দেখ মাথায় ফের কাঁকড়াবিছেটা হুল দিল.....কী যন্ত্রণা!" আচ্ছা লালটেম, বলো তো বোকা লোকগুলো রাজবাড়িটা খুঁজে পায় না কেন? তোমাদের এত কাছে, জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই তো রয়েছে, তবু খুঁজে পায় না কেন? আর যে দু-একজন খুঁজে পায় সেগুলো একদম তোমার মতোই আহাম্মক। লালটেম, লক্ষ্মী ছেলে, যদি একটা মোহরও দয়া করে নাও তবে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। নেবে?"

বাইরে মহারাজা ভীষণ রেগে চেঁচায় 'গাঁ-আঁ'।

লালটেম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, "নিলেই তো তোমার মতো দশা হবে।"

এই বলে লালটেম বেরিয়ে আসে গটগট করে। মহারাজা তাকে দেখে খুশি হয়ে কান লটপট করে, গা শোঁকে, পা দাপিয়ে আনন্দ জানায়।

পরদিন থেকে আবার লালটেম মোষ চরাতে যায়। সাথিদের সঙ্গে খেলে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, চা-বাগান দেখে তার ভারি আনন্দ হয়। রোদ আর আলো, মেঘ আর বৃষ্টি, বাতাস আর দিগন্ত তাকে কত আদর জানায় নানাভাবে।

কোনোদিন তার খাবার থাকে। কোনোদিন থাকে না। যেদিন খাবার জোটে না, সেদিন সে মহারাজার পিঠে শুয়ে-শুয়ে আকাশ দেখে। তার মনে হয়, সে বেশ আছে। খুব ভালো আছে। তার কোনো দুঃখ নেই।

ঘুড়ি ও দৈববাণী

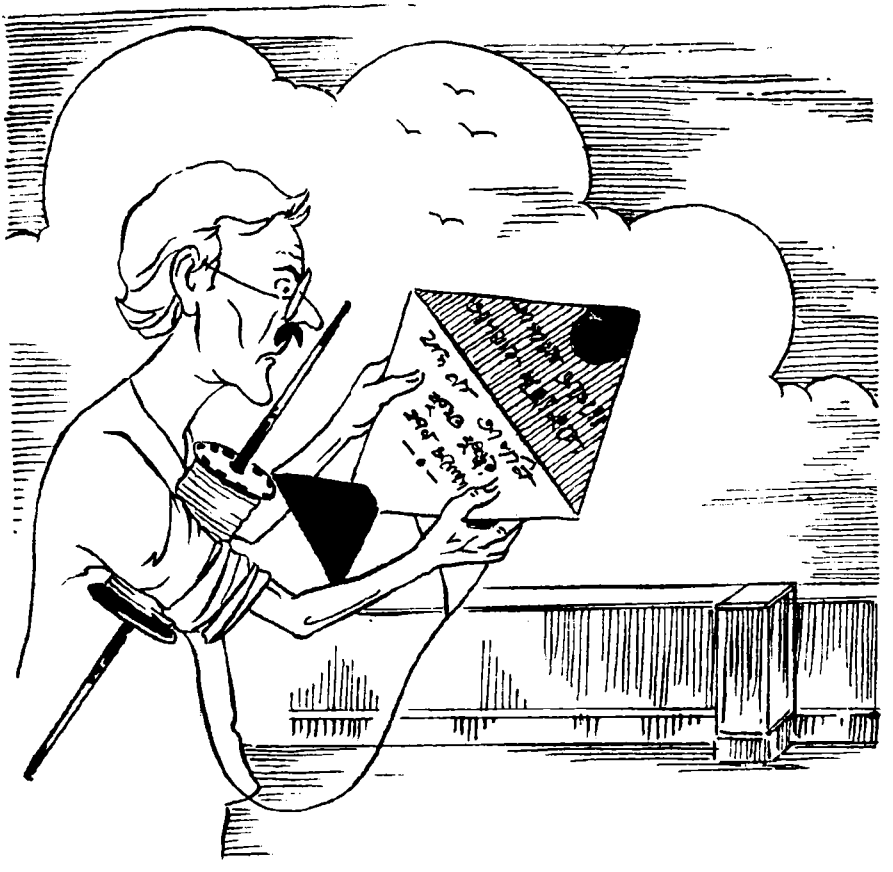

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়োই রোগা-ভোগা। তাঁর হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তাঁর উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালোবাসেন। তাঁর শখ-শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। বিকেল বেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হল ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো

জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে-মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার ওপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদ্ঘুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি? মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে লেখাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব হল?

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেয়ো না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনো রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কি আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাতদিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে-মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তাঁর জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দুদিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, সে হল এ পাড়ার কুখ্যাত গুণ্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক আদেশ অমান্য করতেও তাঁর সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দ তারিখ।

সন্ধ্যের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণকুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণকুণ্ডু তখন একটা মস্ত বড়ো ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাঁকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকুণ্ডুর বাঁ কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন। কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণকুণ্ডু ছুটে এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে

ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দুখানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুঁষি মারতে লাগল। তিনি ঘুঁষি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল-চড়-ঘুঁষি পড়তে লাগল। জীবনে এরকম সাংঘাতিক মার কখনো খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন। বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বোধহয় ভালো। কারণ, অঘোরবাবুর অফিসের বড়ো সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারি, তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেন না। তাছাড়া বড়ো সাহেবের নাগাল পাওয়া কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারা থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হল না তাঁর। দোকান থেকে দই আনিয়ে গেলাস ভরতি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাক্সে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়োবাবুকে গিয়ে একবার বললেন, বড়ো সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়োবাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছো কেন? বড়ো সাহেব কি হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন? আর করেই বা লাভ কী? সাহেবের আমেরিকান ইংরিজি কি তুমি বুঝবে? বকুনি শুনলে ভড়কে যাবে যে!

বেজার মুখে ফিরে এলেন বটে অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে বেরিয়ে করিডোর ঘুরে সোজা বড়ো সাহেবের খাস কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড়ো সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড়ো সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপি রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাক্সটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলটা ঢেলে দিলেন।

তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশেও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কী করে?

সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামীকালই সতেরো তারিখ। বিকেলে অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুণি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।

অঘোরবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফত দৈববাণীই হচ্ছে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়েছে, দৈববাণীর আদেশ না মানলে যদি ভগবান চটে যান?

অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জল-ভরা চোখে একবার দেখে নিলেন। এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কোঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ে খটাং-এ, মাথার কটাং-এ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হল। তারপর বাড়িতে এনে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তাঁর। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তাঁর বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?

তোমার হার্ট একদম ভালো হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে হল?

ওই যে কেষ্ট গুণ্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপিতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ কাজই করছিল না। এখন কাজ করছে। আরও একটা ব্যাপার!

আবার কী?

তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।

বলো কি হে!

হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগ-জীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।

অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?

হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার।

হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হয়। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোন আশা নেই।

অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি-টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে এক লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এল। অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সি সাহেবটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোরবাবুর প্রাণ যায় আর কি।

তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিনগুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করে নিচ্ছি। তোমার দু হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।

অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছিলেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?

সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখ এখন আমার মাথা ভরতি সোনালি চুল।

তাই বটে। ইনি তো বড়ো সাহেবই বটে। মাথা ভরতি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যত না গরিব তার চেয়েও ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কি না কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন তা সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে। বাস্তবিকই জুতোজোড়া এত ছেঁড়া আর তাপ্পিমারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণছুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তা হলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও সারানো, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটোখাটো দর্জির কাজ—সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি

বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায়-লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা করে নেয়। ছোটো ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে একটা ডাণ্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল। এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাঝরাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরনো বাড়ির রকে উঠে ঝুলবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতো লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে শ্যামবাবু। এসে গেছেন তা হলে?

আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না-হলেই বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, আমি তো দাবা খেলতে জানি না।

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সব সময়ে কি রসিকতা করতে হয়?

ভিতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এই সব পুরনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনও ঢোকেননি। যেদিকে তাকান, চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ-বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, এ-কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালগিরির.....

ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে

ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া, তাপ্পি-দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাটার কী হল?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, জাপানি ছাতা?

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে চিমটি কেটে বলল, আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক'টা আছে বলুন।

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপ্‌সপ্‌ করছিল। কদম্ববাবু জুতোজোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতোজোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, সেই সোনালি সুতোর কাজ-করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে তারা কৃপণ। তারা ভাবে যে তারা যা করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। এমন-কি তিনি যে শ্যামবাবু নন, এ-কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি। লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে, এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!

কদম্ববাবু এ-কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরণে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না।

যেন তার মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা বলে উঠল, নাঃ, আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়োলোকদেরও কি আর মাঝে-মাঝে গরিব সাজতে ইচ্ছে যায় না! নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালিমারা জামা, পরনে হেটো ধুতি হয় কী করে!

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন বটে।

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কী শ্রী! দু'ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নীচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড়ো একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তবে শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু-ধারে সারি-সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেওয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক-একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে.....

নাঃ কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখানা ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!

কদম্ববাবু হেঃ হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ-সিঁড়িতে পা রাখতেও তার লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেওয়ালে রুপোর বাঁধানো বড়ো বড়ো ফটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, হল কী শ্যামবাবুর? অ্যাঁ। এ-বাড়ি কি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনা মহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে-থেকে হেদিয়ে পড়লেন! আসুন তাড়াতাড়ি।

সোনামহল্লা! কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপোমহলেই যে লাখো লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে!

কিংখাবের একটা পর্দা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমন কি পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওলা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা-ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝখানে একটা নীচু সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনা-বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন, তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, এই যে শ্যামকান্ত, এসো।

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটা খোপে আবার হিরে,

মুক্তো, চুনি আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি, অন্য ধারে রুপোর। প্রত্যেকটা ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুচি করে হিরে বসানো।

বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো, আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা?

এই হল আমার বাজি।

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সের ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড়ো হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

তুমি কী বাজি রাখবে শ্যামবাবু?

কদম্ববাবু আমতা আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ, কী আজ বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয়, সে আবার কেমন গরিব?

আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন!

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে-কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।

টাকার ওপর ঘেন্না! কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ হাঁ করে উঠল। কর্তাবাবু গভীর গলায় বললেন, আজ সকালে মনটা খুব খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলুম জান? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।

অ্যাঁ?

শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাক তাড়ালুম। এতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হিরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলেন। লোকটা বলে কী?

কর্তাবাবু বললেন, এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, টাকা-পয়সা হিরে-জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।

কলম! কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উল্টোদিকে। কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, সাবাস্!

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাৎ!

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে কদম্ববাবুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন। যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেওয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল! ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝের পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে.....

কদম্ববাবু পড়ি-কি-মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছালেন। দরজাটা অক্ষত আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবলেন, সত্যিই তো। টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি।

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন দামি একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্য কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি আর ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-কাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।

পুরোনো জিনিস

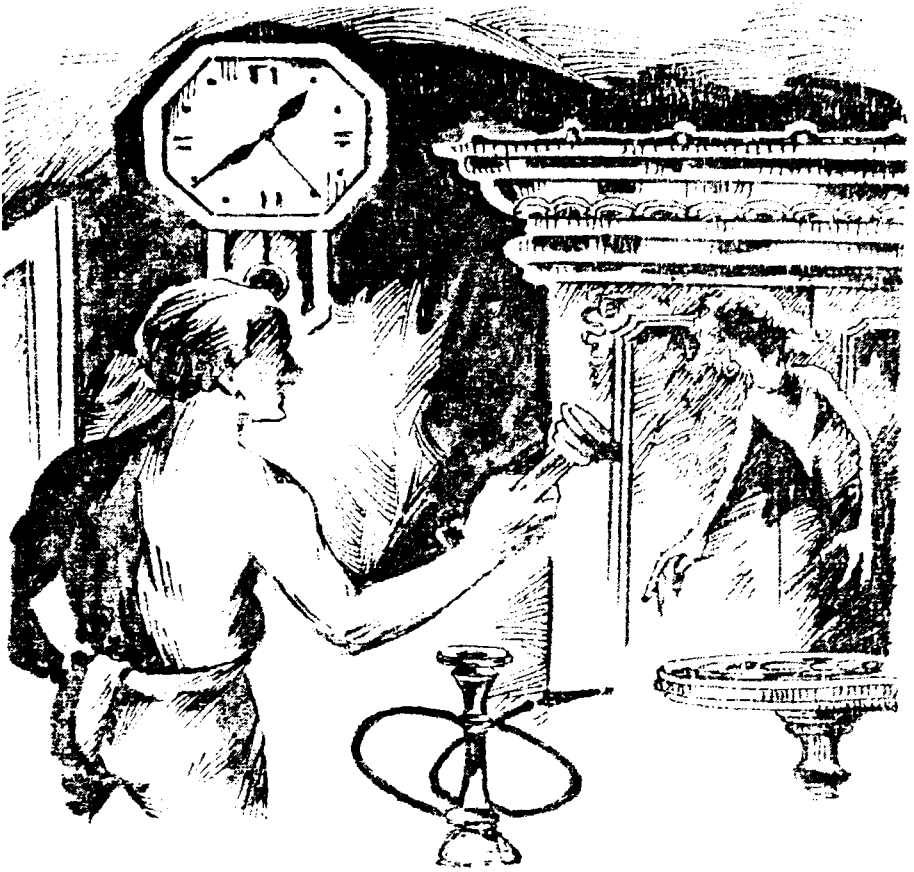

মদনবাবুর একটাই নেশা পুরোনো জিনিস কেনা। মদনবাবুর পৈতৃক বাড়িটা বিশাল, তাঁর টাকারও অভাব নেই বিয়ে টিয়ে করেননি বলে, এই একটা বাতিক নিয়ে থাকেন। বয়স খুব বেশিও নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তিনি ছাড়া বাড়িতে একটি পুরনো রাঁধুনি বামুন আর বুড়ো চাকর আছে। মদনবাবু দিব্যি আছেন। ঝুট ঝামেলা নেই, কত পুরোনো জিনিস, কিম্ভুত জিনিস কিনে ঘরে ডাঁই করেছেন তার হিসেব নেই। তবে জিনিসগুলো ঝাড়পোঁছ করে সযত্নে রক্ষা করেন তিনি, ইঁদুর আরশোলা উইপোকার বাসা হতে দেন না। ট্যাঁক ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, আলমারি, খাট-পালং, ডেস্ক, টেবিল-চেয়ার, দোয়াতদানি, নস্যির ডিবে, কলম, ঝাড়লণ্ঠন, বাসনপত্র সবই তাঁর সংগ্রহে আছে।

খবরের কাগজে তিনি সবচেয়ে মন দিয়ে পড়েন পুরোনো জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন; রোজ অবশ্য ওরকম বিজ্ঞাপন থাকে না। কিন্তু রবিবারের কাগজে একটি দুটি থাকেই।

আজ রবিবার সকালে মদনবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ম্যাকফারলন সাহেবের দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ির সব জিনিস বিক্রি করা হবে।

ব্রড স্ট্রিটে ম্যাকফারলন সাহেবের যে বাড়িটা আজও টিকে আছে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পড়ো পড়ো অবস্থা। কর্পোরেশন থেকে বহুবার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বুড়ো ম্যাকফারলনের আর সরবার জায়গা ছিল না বলে বাড়িটা ভাঙা হয়নি। ওই বাড়িতে ম্যাকফারলনদের তিন পুরুষের বাস। জন ম্যাকফারলনের সঙ্গে মদনবাবুর একটু চেনা ছিল, কারণ জন ম্যাকফারলনেরও পুরোনো জিনিস কেনার বাতিক। মাত্র মাস পাঁচেক আগে সাহেব মারা যান। তখনই মদনবাবু তাঁর জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে আগে থেকেই বাড়ি এবং জিনিসপত্র বাঁধা দেওয়া ছিল। সেই ব্যবসায়ী মদনবাবুকে সাফ বলে দিয়েছিল, উঁটকো ক্রেতাকে জিনিস বিক্রি করা হবে না। নিলামে চড়ানো হবে।

মদনবাবু তাঁর বুড়ো চাকরকে ডেকে বললেন, ওরে ভজা, আমি চললুম, দোতলার হলঘরটার উত্তর দিক থেকে পিয়ানোটাকে সরিয়ে কোণে ঠেলে দিস, আজ কিছু নতুন জিনিস আসবে।

ভজা মাথা নেড়ে বলে, নতুন নয় পুরোনো।

ওই হল। আর রাঁধুনিকে বলিস খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে যেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।

মদনবাবু ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যখন ম্যাকফারলনের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। মদনবাবু বেশির ভাগ লোককেই চেনেন। এরা সকলেই পুরোনো জিনিসের সমঝদার এবং খদ্দের। সকলেরই বিলক্ষণ টাকা আছে। মদনবাবু বুঝলেন আজ তাঁর কপালে কষ্ট আছে। আদৌ কোনও জিনিসে হাত দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

নিলামের আগে খদ্দেররা এঘর ওঘর ঘুরে ম্যাকফারলনের বিপুল সংগ্রহরাশি দেখছেন। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছোটোখাটো জিনিসের এক খনি বিশেষ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরেন তা ভাবতে গিয়ে মদনবাবু হিমসিম খেতে লাগলেন।

বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হল। একটা করে জিনিস নিলামে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক পড়ে যায়। মদনবাবুর চোখের সামনে একটা মেহগিনির পালঙ্ক দশ হাজার টাকায় বিকিয়ে গেল। একটা কাট গ্লাসের পান পাত্রের সেট বিকিয়ে গেল বারো হাজার টাকায়। এক ছড়া মুক্তোমালার দাম উঠল চল্লিশ হাজার।

মদনবাবু বেলা চারটে অবধি একটা জিনিসও ধরতে পারলেন না। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। দর আজ যেন বড্ড বেশি উঠে যাচ্ছে।

একেবারে শেষদিকে একটা পুরোনো কাঠের আলমারি নিলামে উঠল, বেশ বড়োসড়ো এবং সাদামাটা আলমারিটা অন্তত একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কব্জা করার জন্য মদনবাবু প্রথমেই দর হাঁকলেন পাঁচ হাজার।

একটা বুড়ো হাঁকল বিশ হাজার।

মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। একটা কাঠের আলমারির দর এত ওঠার কথাই নয়। কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি? নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

তবে মদনবাবুর মর্যাদাতেও লাগছিল খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা। একটা কিছু নিয়ে না যেতে পারলে নিজের কাছেই যে নিজে মুখ দেখাতে পারবেন না, মদনবাবু তাই মরিয়া হয়ে ডাকলেন, একুশ হাজার।

আশ্চর্য এই যে, দর আর উঠল না।

একুশ হাজার টাকায় আলমারিটা কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন মদনবাবু। যদিও মনে মনে বুঝলেন, দরটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আলমারিটা কুলিরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। দোতলার হলঘরের উত্তর দিকে জানালার পাশেই সেটা রাখা হল। বেশ ভারী জিনিস। দশটা কুলি গলদঘর্ম হয়ে গেছে এটাকে তুলতে।

নিলামওয়ালার দেওয়া চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন মদনবাবু। নীচে আর ওপরে কয়েকটা ড্রয়ার। মাঝখানে ওয়ার্ডরোব। মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন জিনিসটা বর্মা সেগুন কাঠের তৈরি ভালো জিনিস। কিন্তু একুশ হাজার টাকা দরটা বেজায় বেশি হয়ে গেছে। তা আর কী করা! এ নেশা যার আছে তাকে মাঝে মাঝে ঠকতেই হয়।

একুশ হাজার টাকার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মদনবাবু। গভীররাতে ম্যাকফারলন সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন, বুড়ো তাঁকে বলছে, তুমি মোটেই ঠকোনি হে, বরং জিতেছ।

মদনবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সাহেব, নিছক কাঠের আলমারির জন্য দর হাঁকাটা আমার ঠিক হয়নি।

ম্যাকফারলন শুধু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, না না আমার তা মনে হয় না.....আমার তা মনে হয় না.....

মদনবাবু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একবার জল খান রোজই। আজও ঘুম ভাঙল। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলেন, পাশের হলঘর থেকে যেন একটু খুটুর শব্দ আসছে। ওই ঘরে তাঁর সব সাধের পুরোনো জিনিস। মদনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ নিয়ে পাশের ঘরে হানা দিলেন।

টর্চটা জ্বালাতে যাবেন এমন সময় কে যেন বলে উঠল, দয়া করে বাতি জ্বালবে না, আমার অসুবিধে হবে।

মদনবাবু ভারি রেগে গেলেন, টর্চের স্যুইচ টিপে বললেন আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো! চুরি করতে ঢুকে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে! কে হে তুমি?

চোরটা যে কে বা কেমন তা বোঝা গেল না। কারণ টর্চটা জ্বলল না। মদনবাবু টর্চটা বিস্তর ঝাঁকালেন, নাড়ালেন উলটে পালটে সুইচ টিপলেন, বাতি জ্বলল না।

এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি!

কে যেন মোলায়েম স্বরে বলল অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

মদনবাবু চোরকে ধরার জন্য আস্তিন গোটাতে গিয়ে টের পেলেন যে, তাঁর গায়ে জামা নেই, আজ গরম বলে খালি গায়ে শুয়েছিলেন, হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক মারলেন, শিগগির বেরো বলছি নইলে গুলি করব। আমার কিন্তু রিভলবার আছে।

নেই।

কে বলল নেই।

—জানি কিনা।

—কিন্তু লাঠি আছে।

—খুঁজে পাবেন না।

—কে বলল খুঁজে পাব না?

—অন্ধকারে লাঠি খোঁজা কি সোজা?

—আমার গায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর এক ঘুঁষিতে নারকেল ফাটাতে পারি।

—কোনোদিন ফাটাননি।

—কে বলল ফাটাইনি?

—জানি কিনা আপনার গায়ে তেমন জোরই নেই!

—আমি লোক ডাকি দাঁড়াও।

—কেউ আসবে না। কিন্তু খামোকা কেন চেঁচাচ্ছেন?

—চেঁচাব না? আমার এত সাধের সব জিনিস এঘরে আর এই ঘরেই কিনা চোর!

—চোর বটে, কিন্তু এলেবেলে চোর নই মশাই।

—তার মানে?

—কাল সকালে বুঝবেন। এখন যান গিয়ে ঘুমোন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।

মদনবাবু ফের ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। দুরু দুরু বুকে বসে থেকে পাশের ঘরের নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলেন। তাঁর সাধের সব জিনিস বুঝি এবারে যায়!

দিনের আলো ফুটতেই মদনবাবু গিয়ে হলঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। ম্যাকফারলনের সেই কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট আর একটা গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লক হলঘরে দিব্যি সাজিয়ে রাখা। এ দুটো জিনিস কিনেছিল দুজন আলাদা খদ্দের। খুশি হবেন কি দুঃখিত হবেন তা বুঝতে পারলেন না মদনবাবু। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে খুশিই লাগছিল তাঁর।

আবার রাত হল। মদনবাবু খেয়েদেয়ে শয্যা নিলেন। তবে ঘুম এল না। এ পাশ ও পাশ করতে করতে একটু তন্দ্রা মতো এল। হঠাৎ হলঘরে আগের মতো শব্দ শুনে তড়াক করে উঠে পড়লেন। হলঘরে গিয়ে ঠুকে টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলেন।

কে?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার? যান না গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমাদের কাজ করতে দিন!

মদনবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তোমরা কারা বাবারা!

সে কথা শুনলে আপনি ভয় খাবেন।

ইয়ে তা আমি একটু ভীতু বটে। কিন্তু বাবারা এসব কী হচ্ছে একটু জানতে পারি?

খারাপ তো কিছু হয়নি মশাই। আপনার তো লাভই হচ্ছে।

তা হচ্ছে, তবে কিনা চুরির দায়ে না পড়ি। তোমরা কি চোর—

লোকটা এবার রেগে গিয়ে বলল, কাল থেকে চোর চোর করে গলা শুকোচ্ছেন কেন? আমরা ফালতু চোর নই।

—তবে?

আমরা ম্যাকফারলন সাহেবের সব চেলা চামুণ্ডা। আমি হলুম গে সর্দার, যাকে আপনি কিনেছেন একুশ হাজার টাকায়।

—আলমারি!

আজ্ঞে। আমরা সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যে খুশি আমাদের কিনুক না কেন আমরা শেষ অবধি সবাই মিলেমিশে থাকব, তাই—

—তাই কি?

—তাই সবাই জোট বাঁধছি, তাতে আখেরে আপনারই লাভ।

মদনবাবু বেশ খুশিই হলেন। তবু মুখে একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বললেন, কিন্তু বাবারা দেখো যেন চুরির দায়ে না পড়ি।

—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ না করে যান না নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকুন গে। কাজ করতে দিন।

মদনবাবু তাই করলেন। শুয়ে খুব ফিচিক ফিচিক হাসতে লাগলেন, হলঘরটা ভরে যাবে, দোতলা তিনতলায় যা ফাঁকা আছে তাও আর ফাঁকা থাকবে না। এবার চারতলাটা না তুললেই নয়।

ভূতের ভবিষ্যৎ

বাসবনলিনীদেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যে-সব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু' হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড়ো কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার।

ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ্। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পালটাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমত বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে, 'নাড়ু খাব, নাড়ু খাব' বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড়ো ছেলের ছোটো ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ ছেলে, বা কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন। কাজেই, অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোন্‌টা খেতে ভালোবাসে, কোন্‌টা পরতে পছন্দ কর, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভীতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কমপিউটারে নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, 'মা নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব?'

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম খোপে রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!'

'ভুল হয়ে গেছে মা।'

'অত ভুল হলে চলে কী করে? দেখছিস তো বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি দে তো একটা।'

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, 'খারাপ নয় চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।'

'আচ্ছা মা।' বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক্ করে একটু কাসির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, 'আবার এ-ঘরে ছোঁকছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?'

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ্ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, 'ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার-মার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আন্ডার গ্রাউণ্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।'

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।'

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দু'গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, 'তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?'

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন, 'ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস?'

'যাই মা।' বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, 'বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?'

'খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।'

'তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভালো করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।'

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।'

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?'

'কেন কী হয়েছে?'

'সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যাস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-বড়ো হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।'

'তাই যাও। কিন্তু সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বাড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?'

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এবার অটো বড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয়।'

'দিচ্ছি মা।'

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাঁচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি-বেলুন দিব্যি গড়গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল-পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশ গুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল উপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন

বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি বেলুনে একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপর-নীচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালোবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাব্‌ল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাব্‌ল বা বুদ্বুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্বুদবন্দি হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে। কিন্তু হাঁটতে ভালোবাসেন বলে বাসবনলিনী কদাচিৎ গাড়ি নেন।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোটো ছোটো ট্যাবলেট যা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলে জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো-পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকারই হয় না। শূন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা-থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী

কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনও বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোটো ছোটো ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনও অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারাজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোটো আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্বুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড়ো বড়ো উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনও পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে-নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই-বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, 'কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?'

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভটচায্যের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম-জাম-কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়।

একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের কোনো অসুবিধেই হত না। এই বড়ি বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার-আমসত্ত্বও বড়ো কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।'

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।'

'কেন রে, কী হল?'

'আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারধারে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিয়োতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারি বেয়াড়াপানা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।'

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলিস কী! এ তো সব্বোনেশে কাণ্ড।'

রেমো একটু হেসে বলল, 'তোমরা পুরনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনো খবরই রাখো না। তবে ভালোর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিয়ো না। খাবার-দাবারে বিষটিষও মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।'

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝিবা হার্টফেলই করতেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু এই মুখপোড়ারা খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।'

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কব্জায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতিভাই, তলায় তলায় সকলের সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যাণ্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনেনি?'

'না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।'

'যাই ঠাকুমা, মা বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।'

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখানে বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অক্সিজেন-রুমাল মাঝে-মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউ ঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট-কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিওলারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার, রোবর্ট-নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজি গলায় বলছিলেন, 'ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কান পাকড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে. আক্কেল একদম গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?'

গঙ্গারাম একটু বোকাগোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনও নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, 'শোনো, এখন চাকর-বাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পালটে গেছে।'

আশুবাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?'

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, 'আঃ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি রোবটটা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?'

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, 'শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটেজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আসকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যাণ্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।'

বাসবনলিনী ভীতু গলায় বললেন, 'সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?'

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, 'অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।'

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, 'কী ওষুধ?'

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, 'আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেইজন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।'

'বলো কী! চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।'

'দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না, তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পার না।'

'না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।'

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, 'বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না তার চেয়ে বড়ো কথা, ভয়-টয় পেতে পার।'

'জিনিসটা কী?'

'দেখলেই বুঝবে।'

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ওঁং ফট, ওঁং ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া.....' ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল।

তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?'

আশুবাবু হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, 'এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু লোকটা আসলে কে?'

এ-কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, 'এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত, এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করছিলুম, হচ্ছিল না। তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।'

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু একখানা তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, আর ভয় নেই গিন্নি, ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদেরও ঢিট করবে ওরাই।'

কেলে ভূতটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, 'এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব মাঠান, কোনও চিন্তা করবেন না।'

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবারা!'

ডবল পশুপতি

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালোমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মনটা বড়ো ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়। পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালোই ছিল। তাঁর ঠাকুর্দা পুরোনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহুলোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডন-বৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকা-পয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোটো লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালোই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?' তখন পশুপতিবাবুর ভারি সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, 'বোধহয় ভালোই।' কিংবা, 'মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।' অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, 'পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?'

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপুতবাবু শুধু 'হুম্, হুম্, হুম্' শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'ব্যায়াম করছেন? খুব ভালো। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয় খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুণ্ডা-বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।'

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সি রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন। লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, 'লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনও কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না।

তার ভালো দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।'

পশুপতিবাবু রাগবেন কি খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'ও হে নিতাই, তোমার পুরনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কীসের? বাপ-পিতেমোর অত বড়ো বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন, কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, 'আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তাহলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।'

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভূজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, 'আমি বলি কী, পশুপতিবাবু কি আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন? তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকি। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি

পারবে না হে নিতাই', তখন আমিও বললুম, 'ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে-গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পূবদক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।'

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।'

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালোমানুষ হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাঁকে কোনও প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্বেগ হুটোহুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল-টল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?'

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হইহট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতেও পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলায় বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দুজন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু'হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকে একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'পশুপতি, এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জান, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।'

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁহাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড়ো মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজো ছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে, ভাবতে ক্লান্ত হয়ে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারি অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

'কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতি-ভায়া?'

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, 'আর খুব আস্তেও মারনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।'

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

'বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন্ আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুঁড়েছিলেন? তাও ছোটোখাটো ঢিল নয়, অ্যাত বড়ো বড়ো পাথর। তার দু'খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কি পাগল না পাজি?'

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, 'আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।'

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি মাথা চুলকাতে লাগলেন।

নিতাই বলল, 'না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কি ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ কর না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।'

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা গলায় বলল, 'আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসেছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায়, তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজো ছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতোই ভাই, কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছ, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ কর না তা তো আর বেচারা জানত না।'

পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, 'বাবা রে, মেরে ফেললে।' আর একজন বলে উঠল, 'এসব ঠিক কাজ হচ্ছে?' আর একজন, 'ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!' আর একজন, ''আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!' সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, 'ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এ মুখো হব না।'

পশুপতি ভাবতে-ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনও কুলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে-মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

কোগ্রামের মধু পণ্ডিত

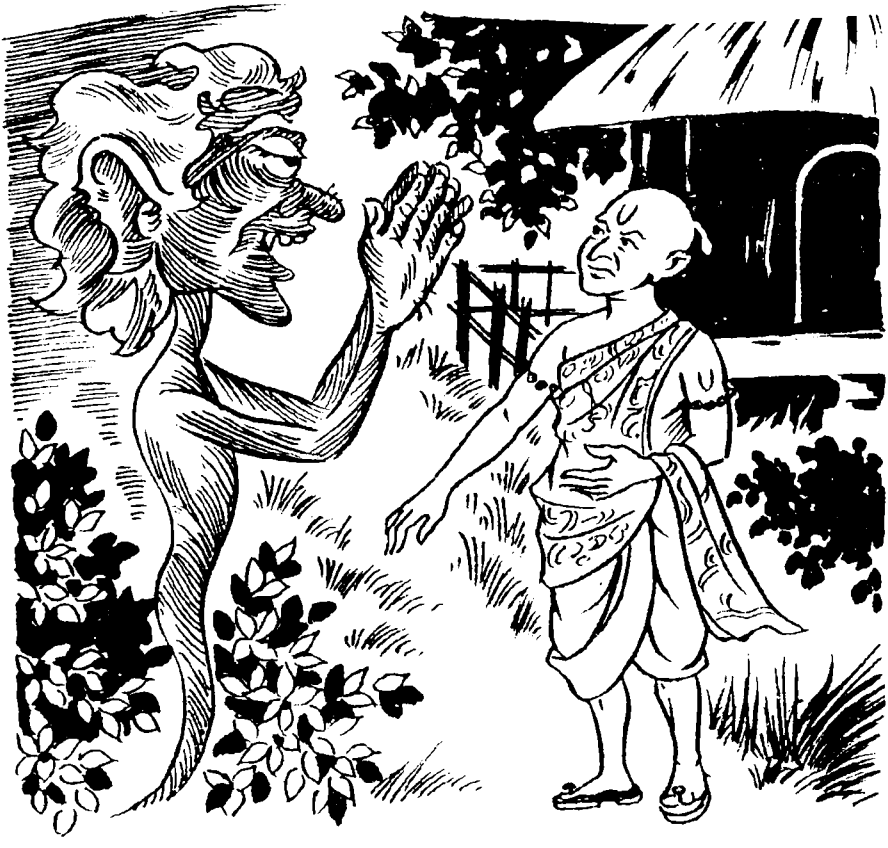

বিপদে পড়লে লোকে বলে, ত্রাহি মধুসূদন।

তা কোগ্রামের লোকেরাও তাই বলত। কিন্তু তারা কথাটা বলত মধুসূদন পণ্ডিতকে। বাস্তবিক মধুসূদন ছিল কোগ্রামের মানুষদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যেমনি বামনাই তেজ, তেমনি সর্ববিদ্যাবিশারদ। চিকিৎসা জানতেন, বিজ্ঞান জানতেন, চাষবাস জানতেন, মারণ-উচাটন জানতেন, তাঁর আমলে গাঁয়ের লোক মরত না।

সাঁঝের বেলা একদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগী বগলাবাবু মধুসূদনের বাড়িতে পাঁচন আনতে গেছেন। গিয়ে দেখেন গোটা চারেক মুশকো চেহারার গোঁফওয়ালা লোক উঠানে হ্যারিকেনের আলোয় খেতে বসেছে। আর মধু-গিন্নি তাদের পরিবেশন করছে। লোকগুলোর চেহারা ডাকাতের মতো, চোখ চারদিকে ঘুরছে, পাশে পেল্লায় পেল্লায় চারটে কাঁটাওলা মুগুর রাখা।

মধু পণ্ডিত বগলাবাবুকে বলল, ওই চারজন অনেক দূর থেকে এসেছে তো, আবার এক্ষুণি ফিরে যাবে, অনেকটা রাস্তা, তাই খাইয়ে দিচ্ছি।

কথাটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই! মধু পণ্ডিতের বাড়ির উনুনকে সবাই বলে রাবণের চিতা। জ্বলছে তো জ্বলছেই, অতিথিরও কামাই নেই, অতিথি সৎকারেরও বিরাম নেই। বগলাবাবু বললেন, তা ভালো কিন্তু আমারও অনেকটা পথ যেতে হবে, পাঁচনটা করে দাও।

মধু পণ্ডিত বলে, আরে বোসো, হয়ে যাবে এখুনি। ওই চারজন বরং তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাবে 'খন। শচীনখুড়োকে নিয়ে এসেছিল, তা আমি বারণ করে দিয়েছি।

বগলাবাবু চমকে উঠে বললেন, শচীনখুড়োকে কোথায় নেবে! খুড়োর যে এখন তখন অবস্থা। এই তিনবার শ্বাস উঠল।

সেইজন্যেই তো নিতে এসেছিল।

বগলাবাবু ভালো বুঝলেন না। পাঁচন তৈরি হল, লোকগুলোও খাওয়া ছেড়ে উঠল!

মধু পণ্ডিত হুকুম করল, এই, তোরা বগলাদাদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বগলাবাবু কিন্তু-কিন্তু করেও ওদের সঙ্গে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা বাবারা?

লোকগুলো পেন্নাম ঠুকে বলল, যমরাজার দূত, প্রায়ই আসি এদিক পানে। তবে সুবিধে করতে পারি না। ওদিকে যম মশাইকেও কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু মধু পণ্ডিত কাউকেই ছাড়ে না।

সেই কথা শুনে বগলাবাবু ভিরমি খেলেন বটে, কিন্তু মধু পণ্ডিতের খ্যাতি আরও বাড়ল।

হরেন গোঁসাইয়ের টিনের চালে একদিন জ্যোৎস্নারাতে ঢিল পড়ল। হরেন গোঁসাই হচ্ছেন গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোক, বয়স দেড়শো বছরের কিছু বেশি। ডাকাবুকো লোক। লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, কে রে?

মাথা চুলকাতে চুলকাতে একটা তালগাছের মতো লম্বা সুড়ুঙ্গে চেহরার লোক এগিয়ে এসে বলল, আপনার কী অশরীরী কাণ্ড শুরু করলেন বলুন তো! গাঁয়ের ভূত যে সব শেষ হয়ে গেল।

হরেন গোঁসাই হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে?

মানে আর কী বলব বলুন। ভূতেরা হল আত্মা। চিরকাল ভূতগিরি তো তাদের পোষায় না। ডাক পড়লেই আবার মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিতে হয়।

মানুষ মরে আবার টাটকা ছানা-ভূতেরা আসে। তা মশাই এক কোগ্রামে আমরা মোট হাজারখানেক ভূত ছিলাম। কিন্তু গত দেড়শো বছর ধরে একটাও নতুন ভূত আসেনি। এদিকে একটি একটি করে ভূত গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। ইদানীং তো একেবারে জন্মের মড়ক লেগেছে আজ্ঞে। গত মাসখানেক এক চোপাটে চুয়াল্লিশটা ভূত গায়েব হয়ে গেল। সর্দার রাগারাগি করবে।

তা আমি কী করব?

লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, আপনারা কি সব মরতে ভুলে গেছেন? আপনার দিকে তাকিয়েছিলাম বড়ো আশা নিয়ে। কিন্তু আপনিও বেশ ধড়িবাজ লোক আছেন মাইরি! তা মধু পণ্ডিতের ওষুধ না খেলেই কি নয়?

ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে ভূতটা চলে গেল। কিন্তু ক'দিন পরই এক রাতে গাঁয়ের লোক সভয়ে ঘুম ভেঙে শুনল, রাস্তা দিয়ে এক অশরীরী মিছিল চলেছে। তাতে স্লোগান উঠেছে, মধু পণ্ডিত নিপাত যাক্। নিপাত যাক্। এ তন্দরুস্তি ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ, ভুলো মৎ! এ এলার্জি ঝুটা হ্যায়! ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। মধুর নিদান মানছি না। মানছি না। মানব না।

কিন্তু মাস তিনেক পর একদিন সুড়ুঙ্গে ভূতটা খুব কাঁচুমাচু হয়ে পণ্ডিতের বাড়িতে হাজির হল সন্ধ্যেবেলায়।

মধু তামাক খাচ্ছিল, একটু হেসে বলল, কী হে, শুনলাম আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছ তোমরা।

পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, ঘাট হয়েছে।

কী হয়েছে বাপু?

আজ্ঞে আমি সর্দার ছিলাম গতকাল অবধি। আর সব জন্মের মড়কে গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ, আমাদের বুড়ো সর্দার পর্যন্ত মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। আমি একেবারে একা।

একা তো ভালোই, চরেবরে খা গা। এখন তো তোর একচ্ছত্র রাজত্ব।

জিভ কেটে ভূতটা বলল, কী যে বলেন! একা হয়ে এক প্রাণে আর জল নেই বড্ড ভয় করছে আজ্ঞে। খেতে পারছি না, শুতে পারছি না। রাতে শেয়াল ডাকে, প্যাঁচা ডাকে, আমি কেঁপে কেঁপে উঠি।

তা তোর ভয়টা কীসের?

আজ্ঞে, একা হওয়ার পর থেকে আমার ভূতের ভয়ই হয়েছে, যমরাজার পেয়াদাগুলোও ভীষণ ট্যাটন। একা পেয়ে যাতায়াতের পথে আমাকে ডাঙস মেরে যায়।

ঠিক আছে, তুই বরং আমার সঙ্গেই থাক।

সেই থেকে সুড়ঙ্গ ভূতটা মধু পণ্ডিতের বাড়িতে বহাল হল।

একদিন জমিদার কদম্বকেশরের ভাইপো কুন্দকেশর এসে হাজির। গম্ভীর গলায় বললেন, ওহে মধু, একটা কথা ছিল।

মধু তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে বলুন।

আমার বয়স কত জান?

বেশি বলে তো মনে হয় না।

কুন্দকিশোর একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পঁচানব্বুই, বুঝলে? পঁচানব্বই। আমার কাকা কদম্বকেশরের বয়স জান?

খুব বেশি আর কী হবে?

তোমার কাছে বেশি না লাগলেও বেশিই। একশো পঁচিশ বছর।

তা হবে।

আমার কাকা নিঃসন্তান তা তো অন্তত জান।

মধু পণ্ডিত মাথা চুলকে বলে, তা জানি উনি গত হলে আপনারই সব সম্পত্তি পাওয়ার কথা।

জান তা হলে? বাঁচালে, তা হলে এও নিশ্চয়ই জানো কাকার সম্পত্তি পাব এরকম একটা ভরসা পেয়েই আমি গত সত্তরটা বছর কাকার আশ্রয়ে আছি, জানো একদিন জমিদার হয়ে ছড়ি ঘোরাব বলে আমি ভালো করে লেখাপড়া করিনি পর্যন্ত? একদিন জমিদারনি হবে এই আশায় আমার গিন্নি এখনো বুড়ো বয়সেও যে বাড়িতে ঝি-এর অধম খাটে, তা জান, আমার বড় ছেলের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে! শোন বাপু, কাকা মরুক, এ আমি চাই না। কিন্তু হক্কের মরাই লোকে মরছে না কেন? মরলে আমি কান্নাকাটিও করব, কিন্তু করবেন কোথায়। আর নাই যদি মরে বাপু। আর নাই যদি মরে বাপু, তবে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তো যেতে পারে। বৈরাগী হয়ে পথে দিব্যি বাউল গান তো গেয়ে বেড়াতে পারে। তা তোমার ওষুধে কি সে সবেও বারণ নাকি? তোমার নামে লোকে যে কেন মামলা করে না সেইটেই বুঝি না।

মধু পণ্ডিত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বয়স হয়েছে, জানি, কিন্তু তাতে ভয় খাচ্ছেন কেন? বয়স তো একটা সংস্কার মাত্র, শরীর যদি সুস্থ সবল থাকে মানসিকতা যদি স্বাভাবিক থাকে। তবে আপনি একশো বছরেও যুবক। উলটো হলে পঁচিশ বছরেও বুড়ো। এই আপনার কাকাকেই দেখুন না। মোটে তো সোয়া শো বছর বয়স, দেড়শো পেরিয়ে দিব্যি হাঁক ডাক করে বেঁচে থাকবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্দকেশর বললেন, বলছ?

নির্মম সত্যি কথা।

কুন্দকেশর চলে গেলেন। কিছুদিন পর শোনা গেল, তিনি বিরানব্বই বছরের স্ত্রী আর পঁচাত্তর বছরের বড়ো ছেলের হাত ধরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে আজ। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের হাওয়া বইছে। এই দুর্যোগে হঠাৎ মধু পণ্ডিতের দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে মধু একটু অবাক, বেশ দশাসই চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে ঝলমলে জরির পোশাক। ইয়া গোঁপ, ইয়া বাবরি, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় একটা ঝলমলে টুপি, তাতে ময়ূরের পালক, গায়ের রং মিশমিশে কালো বটে, কিন্তু তবুও লোকটি ভারি সুপুরুষ।

মধু পণ্ডিত হাত জোড় করে বললেন, আজ্ঞে আসুন, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমি তোমার যম। জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল।

শুনে মধু পণ্ডিত একটু চমকে উঠল। খুন করবে নাকি? কোমরে একটা ভোজালিও দেখা যাচ্ছে। কাঁপা গলায় মধু বলল আজ্ঞে।

লোকটা হেসে বলল, ভয় পেয়ো না বাপু। আমি ভয় দেখাতে আসিনি। বরং বড়ো ভাইয়ের মতো পরামর্শ দিতে এসেছি। তুমি এই গাঁ না ছাড়লে আমি কাজ করতে পারছি না। আমি যে সত্যিই যমরাজা তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই!

মধু দণ্ডবত হয়ে প্রণাম করে উঠে মাথা চুলকে বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না।

বল কী! যমের চোখ কপালে উঠল, শ্বশুরবাড়ি লোকে ভোলে?

আজ্ঞে অনেকদিনের কথা তো, দাঁড়ান গিন্নিকে জিজ্ঞেস করে আসি, বলে মধু পণ্ডিত ভিতরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে একগাল হেসে বলে, এই বর্ধমানে গোবিন্দপুরে। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি গত হয়েছেন।

যমরাজ বলেন, তা শালাশালীরা তো আছে।

ছিল, এখন আর নেই।

তাদের ছেলে-মেয়েরা সব।

আজ্ঞে তারা গত হয়েছে। তস্য পুত্র-পৌত্রাদিরা আছে বটে। কিন্তু তারাও খুব বুড়ো। গিয়ে হাজির হলে চিনতে পারবে না।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত মধু?

আজ্ঞে মনে নেই।

যমরাজা ডাকলেন চিত্রগুপ্ত! মধুর হিসেবটা দেখ তো।

রোগা সুড়ুঙ্গে একটা লোক গলা বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে দ্‌শো পঁচিশ।

ছিঃ ছিঃ মধু! যমরাজ অভিমানে গলা বাড়িয়ে বললেন, এতদিন বাঁচতে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত ছিল। থাকগে, আমি তোমাকে কিছু বলব না। পৃথিবীর নিয়ম ভেঙে চলছ চলো। মজা টের পাবে।

যমরাজ চলে গেলেন। মধু কিছুদিনের মধ্যেই মজা টের পেতে লাগল।

হয়েছে কি, মধুর ওষুধ যে শুধু মানুষ খায় তা নয়। রোদে শুকুতে দিলে পাখি-পক্ষীও খায়, ঘরে রাখলে পিঁপড়ে ও ধেড়ে ইঁদুরে ভাগ বসায়। তাদের হঠাৎ আয়ু বাড়তে লাগল। কোগ্রামের মশা মাছি পর্যন্ত মরত না। বরং দিন দিন মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ইঁদুর ইত্যাদির দাপট বাড়তে লাগল। আরো মুশকিল হল জীবাণুদের নিয়ে। কলেরা রুগীকে ওষুধ দিয়েছে মধু, তা সে ওষুধ কলেরার পোকাও খানিকটা খেয়ে নেয়। ফলে রোগীও মরে না, কিন্তু তার কলেরাও সারতে চায় না। সান্নিপাতিকে রোগীরও সেই দশা। কোগ্রামে ঘরে ঘরে রোগী দেখা দিতে লাগল। তারা আর ওঠা হাঁটা চলা ফেরা করতে পারে না। কিন্তু ওষুধের জোরে বেঁচে থাকে।

এক শীতের রাতে আবার যমরাজা এলেন।

মধু! কী ঠিক করলে?

আজ্ঞে লোকে বড়ো কষ্ট পাচ্ছে?

তা তো একটু পাবে, এখনো বলো যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও কি না।

শশব্যস্ত দণ্ডবত হয়ে মধু পণ্ডিত বলে, আজ্ঞে না। তবে এখন যদি ওষুধ বন্ধ করি তবে চোখের পলকে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে। একশো বছরের নীচে কোনো লোক নেই।

যমরাজা গম্ভীর হয়ে বলেন, তা একটা ভাববার কথা বটে। তোমার এত প্রিয় গাঁ, তাকে শ্মশান করে দিতে কি আমারই ইচ্ছে? তবে একটা কথা বলি মধু। যেমন আছো থাকো সবাই। তবে গাঁয়ের বাইরে মাতব্বরি করতে কখনো যেয়ো না। আমি গণ্ডি দিয়ে গেলাম। শুধু এই কোগ্রামের তোমরা যতদিন খুশি বেঁচে থাকো। অরুচি যতক্ষণ না হয়। তবে বাইরের কেউ এই গাঁয়ের সন্ধান পাবে না। কানাওলা ভূত চারদিকে পাহারা থাকবে। কোনো লোক এদিকে এসে পড়লে অন্য পথে তাদের ঘুরিয়ে দেবে।

মধু দণ্ডবত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

সেই থেকে আজও শোনা যায়, কোগ্রামের কেউ মরে না। কিন্তু কোথায় সেই গ্রাম তা খুঁজে খুঁজে লোকে হয়রান। আজও কেউ খোঁজ পায়নি।

ইঁদারায় গণ্ডগোল

গাঁয়ে একটা মাত্র ভালো জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সে-জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কি আর খেত! ছোটো ছোটো পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কি গালে হাপিশ করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গণ্ডগোল। কোনো দাঁতের সঙ্গে কোনো দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটনা। থাকগে।

কিন্তু এইরকম গণ্ডগোলের মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারি মুশকিলে

পড়ে গেল সেবার। পেরেক মুখে নিয়ে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। "পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েও ছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।"

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথা নিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় খেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কি! পেটের মধ্যে আট-দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আধঘণ্টার মধ্যে পেটে ব্যথা, মুখে গ্যাঁজলা, ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, "অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছ্যাঁদা, খাদ্যনালী লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।"

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, "পুরোনো ইঁদারার জল খাওয়াও।"

ঘটিভরে সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরো বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই ইঁদারার জল খেয়ে কোনো ব্যামোই হয়না।

কিন্তু ইদানীং একটা বড়ো মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সব সময়ে যে ছেঁড়ে তাও নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিঁট কে যেন সযত্নে খুলে নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয়, ততবারই এক ব্যাপার।

গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। "ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।"

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ভায়ারা, দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলুস্থুলু কাণ্ড হয়েছে। দেখেছ কখনো ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারো খেয়ে কাজ নেই।"

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড়ো ভালোমানুষ। ধর্মভীরু নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন।

গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফর্সা নাদুস-নুদুস চেহারা। নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, "আজ্ঞে গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।"

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো, রেগে গেলে তাঁর ধারে কাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজো ছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে এক গাল হেসে নতুন বউয়ের হাতে সেই গোরুবাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গোরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সবচেয়ে ভালো গোরু। দু বেলায় সাত সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধের তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গোরু এনে হাজির করায় চারিদিকে সে কী ছিছিক্কার। আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণ হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, "কী চায় ওরা?"

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সব সময়ে আস্ত একটা হুত্তুকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোঁক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হুত্তুকিটা নেই। বুঝতে পারলেন, চমকানোর সময়ে সেটা গলায় চলে গিয়েছিল। ঢোঁক গেলার সময়ে গিলে ফেলেছেন।

আস্ত হুত্তুকিটা পেটে গিয়ে হজম হবে কি না! একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না! গাঁয়ে ফিরে পুরোনো ইঁদারায় এক ঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁঝরা। বামুন ভোজনের নেমন্তন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু বালতি মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা ভাজা সোনা মুগের ডাল খেয়েছিলেন। আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধে ফলারের নেমন্তন্নে দুটো আস্ত প্রমাণ সাইজের কাঁঠাল, এক অন্নপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস, জমিদারমশাইয়ের সেজো ছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দুহাঁড়ি দই আর দু-সের রসেগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায় সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের মধ্যে চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন।

তবে এসব খাওয়া দাওয়ার পিছনে আছে পুরোনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেতে ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হত্তুকি গিলে ফেলে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হত্তুকি এমনিতেই বড়ো ভালো জিনিস। কিন্তু আস্ত হত্তুকি পেটে গেলে হজম হবে কি না, সেইটেই প্রশ্ন। পুরোনো ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হত্তুকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোরে দাঁড়িয়ে বললেন, "রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরোনো ইঁদারার জল বড়ো বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনো রোগ বালাই আমার গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।"

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, "হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড়ো গোরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?"

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, "ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেকরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তাছাড়া ব্রাহ্মণকে গো-দান করলে পাপ হয় বলে কোনো শাস্ত্রে নেই। গো-দান মহা পুণ্য কর্ম।"

রায়মশাইয়ের নতুন সভাপণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্যও মাথা নেড়ে বললেন, "কটু প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।"

রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললে, "ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার আমার অগ্নিমান্দ্যের সময় গোবিন্দপুর থেকে পুরোনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়! খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?"

চক্কোত্তিমশাই ট্যাক থেকে আর একটা হত্তুকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, "আজ্ঞে না। তাতে এখনো কাকচক্ষু জল টলটল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা-ই নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।"

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, 'কার এত সাহস?'

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়ে চড়ে বসল। মাথার ওপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা।

ঠাকুরমশাই বললেন, 'আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারো নেই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না চেনে! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না কুলোলে

আপনি শাসন করবেন। কিন্তু এ কাজ যাঁরা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।'

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই 'ওরে বলিস না, বলিস না।'

সবাই তাজ্জব।

নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলো।'

চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হুক্কুকিটাও গিলে ফেলতে-ফেলতে অতি কষ্টে সামাল দিলেন।

রায়মশাইয়ের বড়ো ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না, শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, 'কী যেন বলছিলি?'

চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলল, 'আজ্ঞে সে এক অশরীরী কাণ্ড। ভূ....'

'বলিস না! খবরদার বলছি, বলবি না! রায়বাবু আবার কানে হাত চাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করে! নায়েবমশাই 'চোপ বলে একটা প্রকাণ্ড ধমক মারেন।'

একটু বাদে রায়বাবু আবার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, 'ইঁদারার জলে কী যেন?'

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, 'আজ্ঞে সে এক সাঙ্ঘাতিক ভুতুড়ে ব্যাপার।'

'চুপ কর, চুপ কর। রাম রাম রাম রাম!

বলে আবার রায়বাবুর কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে বলেন, 'রেখে ঢেকে বল।'

'আজ্ঞে, বালতি-ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন। শেকল পর্যন্ত ছেঁড়েন। তাছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে কাঁপে।'

'বাবা রে!' বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েব মশাই আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর আপনার ব্যবস্থা তো

দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের ইঁদারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।'

'ইঁদারা বুজিয়ে ফ্যাল গে। ও ইঁদারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি ইঁদারা বোজানোর জন্য গো-গাড়ি করে ভালো মাটি পাঠিয়ে দেব'খন।'

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়, কাছারি ঘরে সব প্রজাই হাঁ-হাঁ করে উঠে বলে, তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরী। তাছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি পোকাও লাগেনি, কয়েকটা ভূত—'

রায়বাবু হুংকার দিলেন, 'চুপ। ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।' সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু ব্যাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্য মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়, একবার যাবেন নাকি সেখানে?

রায়মশাইয়ের আগের সভাপণ্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশো বছর পার করে এখনো বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারি ভুলো মন আর দিনরাত খাই-খাই। তাঁকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপণ্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাকে আনিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্য কতদূর তার পরীক্ষা এখনো হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল তো বটেই, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল-তা সেও বেশি কিছু কথা নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো-গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন। গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার-হাজার লোক।

ভারি সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুল গাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড়োবড়ো ঘাসের বন। পাখি ডাকছে প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে-আস্তে ইঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যি কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, 'কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুথু ফেলব।'

এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুলু পড়ে গেল। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢেউ দিয়ে জল একেবারে ইঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ-বোঁ বাতাসের শব্দ।

লোকজন এই কাণ্ড দেখে দে-দৌড় পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

থুথু ফেলবেন না, থুথু ফেলবেন না, বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালো-কালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়—ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সব কটার গা ভিজে সপ-সপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।

কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঢুকেছিলি কেন এখানে?'

'আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড্ডই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগ-বালাই নেই। একশো দেড়শো বছর হেসে খেলে বাঁচে। না মলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, 'ইঁদারাটা দখল করে থাকি।'

বলে ভূতেরা মাথা চুলকায়।

কেশব বললেন, অতি কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।'

ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলল, 'ওই যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স একশো বিশ বছর। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।'

কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?

একহাতে ধরা পৈতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ করে চক্কোত্তি আমতা-আমতা করে বলেন, ঠিক স্মরণ নেই।'

'কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। কেশব বললেন।

ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারি কূট একটা কথা এল। তিনি ফস্ করে বললেন, 'ভূতেরা কি মরে?'

কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, 'সেটাও কূট প্রশ্ন।'

চক্কোত্তি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি নাই মরে, তবে সেটাও ভালো দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠল, 'তা সে আমরা কী করব? আমাদের হার্টফেল হয় না, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না—তাহলে মরব কীসে! দোষটা কি আমাদের?'

চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলল, 'তাহলের দোষ তো তোমাদেরও নয় বাবা সকল।'

কেশব বললেন, 'অতি কূট প্রশ্ন?'

চক্কোত্তি বলে উঠলেন, 'কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।'

শ' পাঁচেক ছন্নছাড়া, বিদঘুটে ভেজা ভূত চারিদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব।

একটা বুড়ো ভূত কেঁদে উঠে বলল "ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিন রাত জলের মধ্যে থেকে থেকে আমরা পান্তা-ভূত হয়ে গেছি! ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে-কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।"

"এও অতি কূট প্রশ্ন।"

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুথুকে ভূতদের ভারি ভয়। বলার সঙ্গে-সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে "থুথু ফেলবেন না। থুথু দেবেন না!"

কেশব চক্কোত্তিমশাই এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতদের দিকে ফিরে বললেন, "চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথা ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনো মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দুশো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তোমাদের যুক্তি টেকে না!"

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলতে থাকে "আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি।"

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, "তা হয় না। ঘটি বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দুজনে মিলে থু—'

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারায় লাফিয়ে নেমে ঠনাঠন ঘটি বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি বালতির পাহাড় জমে গেল ইঁদারার চারপাশে।

পুরোনো ইঁদারায় এরপর আর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে ক'দিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরো চিমড়ে মেরে গেল। এতো রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের ভয় পেত না।

ভূত ও বিজ্ঞান

সন্ধে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন বলে বেশ জোরেই হাঁটছেন, জোরে হাঁটার আরও একটা কারণ হল আকাশে বেশ ঘন কালো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়ের হাওয়াই চপ্পল জোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দুখানা ছোটো ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোটো মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ানোরও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি

গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে একটা গন্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তাঁর মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে-ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি-বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাঁজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর একটা বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না, সেই ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খৃষ্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সর্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনও ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ-বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, 'কে?'

'কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।'

'বলো ভায়া।'

'বলি, তুমি এখন কোথায়?'

'আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু-হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।'

'বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।'

'বলো কী? তুমি তো ক'দিন আগেও হিউস্টনে ছিলে।'

'তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে। তার আগে নেপচুনে। আমার কি এক জায়গায় থাকলে চলে?'

'তা নবগ্রামে কি মনে করে?'

'একটা সমস্যাই পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।'

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভালো।

পটলবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, কোথায় আছ সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি ক'তে জিরো ইন করো।'

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন, নবগ্রাম

সামনেই। কালবোশেখীর বাতাসটা শুরু হওয়ার আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তাঁর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হল না। মেঘের বলটা হুড়ুম করে এসে যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারিদিক একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিঁটিয়ে গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলাটা তাঁকে যেন খানিক লোফালুফি করে হু-হু করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, 'চোপ।'

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিল তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাঁকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সেক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে-ধীরে চারদিককার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দুশো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন; একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল।

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তাঁর হৃদকম্প হতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হল হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, 'আ আপনি?'

শূন্যে দুখানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, 'বোসো হে পটল, কথা আছে।'

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন। দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ার কোনও ঘন স্তর নেই। তাঁর হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন, 'ভয় পেও না।'

'আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠাণ্ডাও লাগবে না পড়েও যাবে না। নিচে এখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?'

'যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো—'

মারা গেছি? আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হত। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন বাড়িতে ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা করতে থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে-ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধরণা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভুত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।'

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, 'ভূত? কিন্তু ভূত তো—'

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছ, কোনও স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া— এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না।'

'তবে? বিজ্ঞান শিখে এ সব না-মানার অভ্যাস মোটেই ভালো নয়, বুঝলে।'

'যে আজ্ঞে।'

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমার গোপন

ল্যাবরেটরির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী। সে আমার ল্যাবরেটরিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছ।

'যে আজ্ঞে।'

আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

'যে আজ্ঞে।'

'তারপর তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটরিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?'

'খুব খাবে-খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা—'

'উঁহু, নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত-বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে নইলে—'

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজি না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাত করে বললেন, 'আজ্ঞে তাই হবে।'

'তাহলে চলো, নামা যাক।'

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ-সোঁ করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, 'এবার নিজে-নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে।'

'যে আজ্ঞে', বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

দুই পালোয়ান

পালোয়ান কিশোরী সিং-এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাকপক্ষিতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভালো জানত এমন নয়। আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত লোক। সর্বদাই চেলাচামুণ্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোন সুযোগই নেই তার। আর এ কথা কে না জানে যে একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জো পায় না।

সকালে উঠে কিশোরী তার সাকরেদ আর সঙ্গীদের নিয়ে হাজার খানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও না কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়।

সন্ধ্যের পর একটু গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা-হাত-পা দাবিয়ে দেয় তার সাকরেদরা। এই নিশ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢোকবার কোনো ফাঁকই পায় না। গণপতি মাহাতো নামে আর একজন কুস্তিগীর আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ-বিদেশের বিস্তর দৈত্য -দানবের মতো পালোয়ানকে সে কাত করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারেনি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিত করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময়ে কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে ঢুকে এমন পন-পন করতে লাগল হাঁচি না দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হাঁচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিত করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর এক কাণ্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে স্ক্রু প্যাঁচ আঁটছিল গণপতি। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় খেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লন্ডভন্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপতি দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং সে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে না পেয়ে দুই পালোয়ানের দিকে তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, 'গণপতি, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

গণপতি বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না।

ষাঁড়টা গুঁতোতে এলে গণপতি অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপতি লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে—ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতিকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপতি কিছু

গন্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে যুতসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিত হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসীব খারাপ। কিশোরী নয়, চিত হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাত হল। গণপতি রাগে-দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতির সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লড়াইতে কিশোরীর কোনও আশাই নেই। কিশোরী তখন গণপতির নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেইসব চ্যাম্পিয়ন তালদের একজন সেই সময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নিচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতির মাথার মধ্যিখানে।

গণপতির ভালো করে আর ঘটনাটা আর মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপতি কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী, এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড় বিড় করে তুলসীদাসের রামচরিত মানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিত করে তখনও সে নাকি কিছুমাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজীকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতির বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে-ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতিকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারী নামডাক। বড়-বড় ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ-মেডেল পায়। লোকে বলে কিশোরীর মতো পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতির আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, 'ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে

এই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। একবার মশা একবার ষাঁড়, আর একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর একবার লড়বার বড় সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারলে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। তুমি হারলে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের শ্মশানের ধারে ফাঁকা মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে, গণপতি খুব বড়ো পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন-তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে-জিততেও হেরে গেছে। অতবড় পালোয়ানের এই সামান্য আবদারটুকু রাখতে কোনও দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তাছাড়া গণপতিকে যে সে খুব ভালোভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতরাং লজ্জাটা দূর করার এই-ই সুযোগ। এবার গণপতিকে নায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপতি অপেক্ষা করছিল কিশোরীকে দেখে খুশী হয়ে বলল, 'এসেছ। তাহলে লড়াইটা হয়ে যাক।'

কিশোরীও গোঁফ চুমড়ে বলল, 'হোক।'

দুজনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দুদিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল। পয়লা চোটেই গণপতিকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধোবিপাট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সপাটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পোঁ করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাধালো। হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিত করে দিল।

গণপতি বলল, 'আর একবার।'

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, 'আলবাত।'

দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল। লড়াই লাগতে না লাগতেই একটা ষাঁড়

কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিত।

গণপতি বলল, 'আর একবার হবে?'

কিশোরী বলল, 'নিশ্চয়ই।'

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে না লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী 'পাখি সব করে রব' আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিত হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল তখন দেখল, গণপতিকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন যেন কালো-কালো, ঝুলকালির মতো রং, রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

'জীব? না কি অন্য কিছু?'

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতিও আস্তে আস্তে শুকিয়ে, কালচে মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায়নি, 'বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচিয়ে দৌড়তে লেগেছে।

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধার-দেনা করে, কষ্টে জমানো যা-কিছু টাকা-পয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তার বাড়ির কারোর পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন-চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা জন্মেছে। দেয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো-টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, 'এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়।' ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার-ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, 'আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার

টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়! তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।'

কথাটা ঠিক। এই মহীগঞ্জের মতো ছোট গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিতাই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি-খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে-ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসির মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, 'পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা আপনি কে?'

'আজ্ঞে আমি হলুম পরাণচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।'

'অ। তা কাকে খুঁজছেন?'

'আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে, তা বাবু কিছু পেলেনটেলেন? সোনাদানা বা হীরে-জহরত কিছু?'

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, 'তাই বলো! এইজন্য পুরোনো বাড়ি খুঁজে

বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

'ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে-ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কিনা।'

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কি আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরাণ তবু হাল না ছেড়ে বলল, 'তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশো বছরের পুরোনো বাড়ি।

'তা হতে পারে।'

'আর একটা কথা বাবু তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?'

'কে? কাদের কথা বলছ?'

'ওই ইয়ে আর কী—ওই যে রাম নাম করলে যারা পালায়।'

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, 'না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।'

'না বাবু অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কুপিত হলেই মুশকিল।'

'তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।'

'একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।'

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'বোসো-বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।'

লোকটা সসঙ্কোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, 'তা বাবু বাড়িটা কতয় কিনলেন?'

'তা বাপু অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকর্জও হয়ে গেল মেলা।'

'উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।'

'গরিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।'

'আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি।'

ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরাণ দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, 'তা পরাণ, তুমি এখন কোথায় যাবে?'

পরাণ একটা হাই তুলে বলল, 'তাই ভাবছি।'

'ভাবছ মানে! তোমার বাড়ি নেই?'

'আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।'

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো আমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন-চারখানা ঘর আছে। বস্তা-টস্তা পেতে শুতে পারবে না?'

পরাণ দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল-সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, 'চোরটোর নয় তো!'

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, 'হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকা-পয়সা কোথা?'

পরাণ দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুক-ঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কাণ্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে!

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোলো। শুধু পরাণ দাস বলল, 'আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কাণ্ড ঘটে কিনা।'

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, 'কে?'

সামনে হ্যারিকেন হাতে পরাণ দাস। চাপা গলায় বলল, 'পেয়েছি বাবু।'

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, 'কী পেয়েছ?'

'যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।'

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, 'বুড়োকর্তাটা আবার কে?'

'একশো বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন

দুধে-আলতা। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।'

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, 'তুমি নিজে তো পাগল বটেই এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।'

'বিশ্বাস হলো না তো বাবু। আসুন তাহলে নিজের চোখেই দেখবেন।'

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতুহলও হল।

পরাণ দাসের পিছু-পিছু বাড়ির পিছন দিকের রান্না ঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

'এসব কী করেছ হে পরাণ?' মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।'

'যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।'

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসি জাতীয় কিছু।

'আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারী। দুজনা না হলে টেনে তোলা যাবে না।'

ভূতনাথবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়।

বললেন, 'কী আছে ওতে?'

'তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।'

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখ ঢাকা ভারী কলসিটা দুজনে মিলে অতি কষ্টে তুললেন ওপরে। পরাণ একগাল হেসে বলল, 'এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।'

বেশ বড় পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

'বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো, যান আপনার আর কোনও দুঃখ থাকল না। দু-তিন পুরুষ হেসে খেলে চলে যাবে।'

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরাণের দিকে চেয়ে বললেন, 'এসব সত্যি তো স্বপ্ন নয় তো!'

'না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সব কিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হল।'

ভূতনাথবাবু পরাণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।'

পরাণ সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকা-পয়সায় আমার কী হবে বাবু?'

'তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?'

'না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকা-পয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।'

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?'

'আজ্ঞে ওইটেই আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।'

পরাণ দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

মাঝি

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড় অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়।

খবরটা এনেছিল দিনু মণ্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড় সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড় দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড্ড আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড় বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তা মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হল, আজ সকাল থেকেই দুর্যোগ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মণ্ডল বলল, পৌঁছতে পাববে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি ধামাখালি অবধি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হল। সকালবেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গাঁয়ে পৌঁছনো যাবে।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, আজই পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ আর দিনু মণ্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে নিল জয়চাঁদ। এর পর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু-পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বারবার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য বাড়িয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছোনোর কথা, পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। ঝড়, বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনও লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে-ভিজতে দুজনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নাম-গন্ধ নেই। নদীতে বড়ো-বড়ো সাংঘাতিক ঢেউ উঠেছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার কথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মণ্ডল বলল, 'চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতো ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।'

জয়চাঁদ রাজী হল না, বলল, তুমি যাও দিনু দাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিনহাত যেতে-না-যেতে নৌকো উলটে তলিয়ে যাবে।

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি উপায় করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমিও যাচ্ছি।'

দিনু মণ্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উলটে

গেছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনো মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে ভিজতে লাগল। মেয়ের কথা ভেবে কাঁদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা! ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসাব তার মাথা থেকে উড়ে গেছে। বসে আছে তো বসেই আছে। ঝড়-বৃষ্টি একসময়ে প্রচণ্ড বেড়ে উঠল। এমন সাংঘাতিক যে জয়চাঁদ দুবার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে-কাদায় মাখামাখি হল সর্বাঙ্গ।

সামনেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ-সাত হাত উঁচু বড়ো-বড়ো ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছলে আরও পাঁচ-সাত মাইল দূরে তার গাঁ। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীর ভাবে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না? চোখ রগড়ে জয়চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব। তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনো ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়চাঁদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালোই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা, কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা কোমরে বেঁধে নিল। তারপর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনওরকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখা মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড়ো দুঃখ পেল। লোকটা বোধহয় পেটের দায়েই মাছ-টাছ ধরতে এই ঝড় জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজা কোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন-ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে-হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধহয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। উঃ বা আঃ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাকে কিছুক্ষণ দলাই-মলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটি বলল, 'কে বটে তুমি?'

'আমাকে চিনবেন না। গাঙ পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।'

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'ওঃ বড্ড ফাঁড়া গেল আজ। প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তা তুমি যাবে কোথা?'

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'যাবো ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ-সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।'

লোকটা বলল, 'হুঁ। কেমন অসুখ?'

'ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কিনা কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাব কিনা বুঝতে পারছি না।'

লোকটা বলল, 'মেয়েকে বড্ড ভালোবাসো, না?'

'তা বাসি। বড্ডই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা-বাবা করে।'

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'চলো তাহলে।'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'

'তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'খেপেছেন নাকি? কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকো বাইতে

গেলে মারা যাবেন নির্ঘাত। আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভব নয়।'

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'ওহে, বাঁচা-মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হল, চেষ্টা। চলো, নৌকোয় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।'

লোকটার গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকোর খোল থেকে একটা বৈঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকোটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বৈঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল। আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝ দরিয়ায় প্রচণ্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট-পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দুহাতে শক্ত করে নৌকোর দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শাল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বৈঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকোটাকে তীরগতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁ-দিক থেকে। জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'জয়চাঁদ, ভয় পেও না।'

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার নাম তো এর জানার কথা নয়।

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে এক সময়ে নৌকোটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, 'এ ঘাট চেনো জয়চাঁদ?'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বটগাছের দিকে চেয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া! এখানে এত তাড়াতাড়ি কী করে এলাম? নৌকোয় আনন্দপুর আসতে তো সাত-আট ঘণ্টা সময় লাগে।'

'ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।'

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'না। ঝড় তো উলটোদিকে। যাহোক, পৌঁছে তো গেছ।'

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, 'আপনি কে?'

'আমি! আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।'

জয়চাঁদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, 'আপনাকে প্রাণ ফিরে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?'

'বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'করো কী জয়চাঁদ, করো কী? বাড়ি যাও জয়চাঁদ।'

'গিয়ে?'

'মেয়ের কাছে যাও। সে ভালো আছে। অসুখ সেরে গেছে।'

জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে?

বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর, উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোট ডিঙিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে?